KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৭ নং পণ্ডিতিয়া টেরাস, কলকাতা-২৯ (1/1 and 2) 19 Panditia Terrace, cal 29 (1/4 and 2/2)
Collection : KLMLGK	Publisher : দেবকুমার বসু (2/2) Debkumar Bose (2/2) শ্রীযুক্ত সুজল বন্দ্যোপাধ্যায় (1/1 and 2) Sajal Banerjee, (1/4)
Title : অনুভব (ANUBHV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/4 2/2 (SL. NO. 6)	Year of Publication : 1966 বৈশাখ ১৩৭৩ March 1967 মার্চ ১৯৭৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : সোমেন্দ্র ভৌমিক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
ফাল্গুন তেরশো বাহাত্তর

সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক

অন্তর্ভব

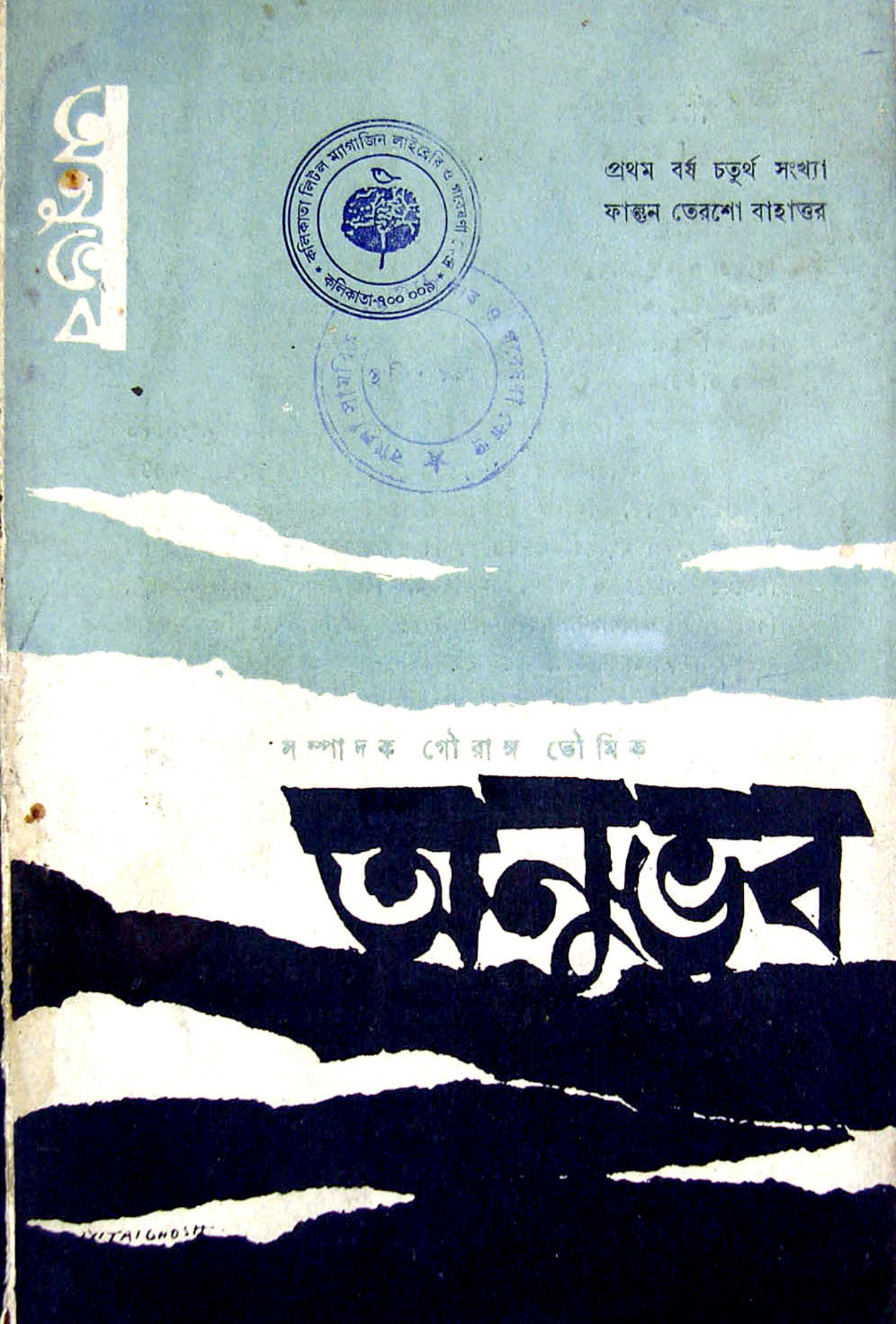

এম, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য গ্রন্থ

সাহিত্য সরণী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

[উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত]

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো

আলোচ্য বিষয়ঃ (১) বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা, (২) বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধযুগ, (৩) চর্যাপদ, (৪) জয়দেবঃ বাঙালির কবি, (৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (৬) বাইশ কবির মনসামঙ্গল, (৭) গোপীচন্দ্রের গান। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক সম্ভাব্য সমস্ত দিক সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। দামঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সারদা মঙ্গলঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত

ভূমিকায় বিহারীলালের জীবন, পরিবেশ, মানসিকতা, রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত, লিরিক কাব্যের ধারায় তাঁর স্থান আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সারদা মঙ্গলের কথা-বস্তু, উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতা, রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, মিষ্টিসিজম, বিহারীলালের সারদার স্বরূপ, বিহারীলালের কবিসামর্থ, পরবর্তী কাব্যে প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদক বিশ্লেষণ করেছেন। বোর্ড বাঁধাই-সুদৃশ্য প্রচ্ছদ!
দামঃ দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভিসারঃ ঘরে-বাইরে। অধ্যাপক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ)

উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

দেশী-বিদেশী রোম্যান্টিক কবি ও কাব্যের ওপর বিদগ্ধ আলোচনার গ্রন্থ। বাঙলা ভাষায় এ জাতীয় বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দামঃ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, চতুরঙ্গ, জীবন স্মৃতি, ছিন্নপত্র প্রভৃতি গ্রন্থের ওপর সুদীর্ঘ আলোচনার গ্রন্থ। ছাত্র, অধ্যাপক, পাঠাগারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। দামঃ চার টাকা।

ইটিম উটিম। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

খুব ছোটদের মতো ছড়া-ছবির একটি সুন্দর সঙ্কলন। প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত। দামঃ এক টাকা।

অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা ১২

তৃষ্ণা, আমার তরী প্রসঙ্গে

রাম বসু

"শিল্পে আমরা অর্জুনের লক্ষ্যে আছি স্থির" সম যন্ত্রণার পাকে কবিতায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঘোষণায় চমকে ওঠা স্বাভাবিক। এও ত এক সার্থক স্বীকৃতি। একটা লক্ষ্য ; যার দিকে সমস্ত চেতনা প্রসারিত। কিন্তু বিশ্বাস, তা যা-ই হোক এবং সেই বিশ্বাসেরও বিস্তার যেমন ভাবেই হোক, যদি সমগ্র চেতনা থেকে উৎসারিত না হয়ে কোন উক্তি বা রূপকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে বিরোধ থেকেই যায়। কবিতার অন্যতম লক্ষণ যেহেতু বিরোধের অবসান অথবা অবসানের জন্য সন্ধান, তাই সেই কবিতা আমাদের মুগ্ধ করতে পারে না।

শিল্প-চেতনা যদি ধর্মের স্থান নেয়, আমার বলার কিছু নেই। সেখানে ধারাবাহিকতা অথবা ঐতিহ্য গতিকে কবিকে সাহায্য করতে পারে জানি না। তবে কবির সমগ্র চরিত্র তার সত্তা ও চেতনার জটিল সংগঠন যদি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে নিতান্তই কল্পনা প্রতিভায় জীবন্ত না হয় তবে সেই কবিতা বড় ম্লান বিবর্ণ ও আটপৌরে হয়ে ওঠে। যা চোখে পড়ে এবং যা সে ক্ষেত্রে মনে সামান্য আঁচড় কাটে তা হলে কয়েকটি উক্তি, ও একটি পংক্তি, যা আবার রঙ্গরা খেলনার মতো অনাদৃত হয় দু'দিন পরেই। কারণ ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতার বাইরে শব্দ ও প্রতীককে নিজের অর্থ খুঁজে নিতে হয়। কবির কল্পনা-প্রতিভা, তার ভিশান বা দৃষ্টির দিব্যতা এবং তার রূপ সন্ধান তখন শব্দ ও প্রতীককে অর্থময় করে তুলতে পারে। আর কবিতার সার্থকতা যদি সুন্দর অর্থহীনতা হয় তবে শিশুর মুখের আজগুবি কথা হলো পৃথিবীর মহত্তম কবিতা। সুখের কথা সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে ব্যগ্র নন।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃষ্ণা, আমার তরী' পড়তে পড়তে আমার এই কথা মনে হয়েছে। আরও মনে হয়েছে, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় যেন দুই মেরুতে এক সঙ্গে চলতে চান। এই বিরোধ কবির চেতনায় হয়ত প্রখর নয়। কারণ বর্তমানে সব কবিতাই আত্মমুখী। অন্তর্নিরীক্ষা তার লক্ষণ। প্রথম মহা যুদ্ধের আগেও কবিতা একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয় নি। তখন অন্তর ও বাহির, সাবজেকট ও অবজেকট একটা অদ্বৈত সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিত। অর্থনৈতিক কারণে সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিযুক্ত মানুষ ; মূল্যবোধ, ধর্ম, ঐতিহ্য,

মানবিকতা, এবং জীবনে ব্যক্তির অনন্য ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ ও নিরাসক্ত মানুষ, মনঃ সমীক্ষার হাত ধরে চলে এসেছে তার বুকের প্রায়ান্ধকার গুহায়। তার ধারণা, সত্য লুকিয়ে আছে ওখানে। ওখানেই নির্মল চেতনা। ওখানে ডুব দিতে পারলে হওয়া যায় অর্থভারহীন সংগীত। কিন্তু একথা কখন মনেও আসে না যে তা হয় না; হয় নি এবং হতেও পারে না। মনেও আসে না, আসলে নিজের বুকে গুটিয়ে আসা পরাজয়। মানুষের পরাজয়, কবি প্রতিভার পরাজয়। এবং কাপুরুষতা এত গভীর যে সেই পরাজয়কে ঢাকা হচ্ছে জয়ের আবরণে। বলা হচ্ছে চেতনার দিগন্তকে আমরা অধিকার করতে চলেছি। যেন কিছু ধোঁয়াটে শব্দ ব্যবহার করলেই অতিন্দ্রিয়তাকে স্পর্শ করা যায়। সজল যখন 'রাজা আমার রাজা' অথবা 'দুটি' কবিতার মত কবিতা লেখেন তখন মনে হয়। তিনিও এই ধারণার শিকার।

কিন্তু আমার কথা এই যে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন কোন বিশেষ রীতি, আদর্শ, বা ভাবনা কবিতার উৎস নয়। কবিতার উৎস আরও গভীরে এবং সেই গভীরের ইংগিত দেওয়ার জন্য এমন কতকগুলি প্রকাশ ভঙ্গি ধার করতে হয় যা হয়ত সময়ের ফ্যাশান। কবিতার নির্মাণে ও স্থাপত্য কলায় যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের অনেকেই বহু প্রচলিত ফ্যাশানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি। তবু উপলব্ধির গাঢ়তায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

অতুলনীয় লক্ষ্যবিহীন নিয়ত চলি ফিরি
শশব্যস্তে ডিঙিয়ে যাই হাজার রকম সিঁড়ি
জ্বলছে কই চতুর্দিকে গানের মত শ্রী
কোথায় সেই সিংহাসন রত্নে মহীয়ান ?

আমরা আশ্বস্ত হই। ভাবি স্পষ্ট অন্বিষ্ট আছে এবং আমাদের আইডেন্টিফিকেশান সম্ভব। এবং আমাদের চার পাশের বাস্তবতাকে আমাদের কাছে শিল্পময় করে তোলার জন্য সজল বলেন :

কাঁচা বয়সের চোখে যৌবনের শিশির ভাদুড়ি
সে তো এক উপাখ্যান সূর্য-ছাঁয়া-ঘুড়ি

কিংবা রেডিও-তে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠ, রাত্রিবেলা বিষ্ণু দে'র কবিতার আলো, কিংবা ধ্রুপদের অনুরূপ সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ, যা অভিজ্ঞতা-জাত, তাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন এবং এই সব অনুষঙ্গ অন্য ক্ষেত্রে কখন কখন দৃশ্যমানকে ছাড়িয়ে অগোচরের ইংগিত দেয়।

বেশ লাগে যখন দেখি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বিরোধের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে যান অনেকটা মাতালের মতো। রবীন্দ্রনাথ বলে কোন কেউ ছিল না বলে যখন তার মনে হয় খুবই সামান্য কারণে তখনই অন্য আভাষ তিনি দিতে পারেন যা আমাদের জীবন মানসে খুব প্রকট। সে হল অন্তহীন তরলতা। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার কোন চেষ্টা না করে ব্যবহার করেন 'লখিন্দর দিন' : 'সমস্ত শহর জলে দাউ দাউ বেলাল্লা চিৎকারে। গ্লানি পাপ হন্যে হয়ে চার পাশে আর্তনাদ করে।" তখন গা ছম্ ছম্ করে। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় এগানে সম্ভবত তার সমসাময়িক। কবি বা তার কবিতার সময়ের বিরুদ্ধে গিয়ে আত্ম-আবিষ্কার করতে চান। কিন্তু আবার এই কবি 'বয়া' বা চাঁদ, সূর্য, তারা; চন্দ্র মল্লিকার মতো কবিতায় সময়ের সাধারণ স্বাক্ষর—অগভীর অস্পষ্টতাকে স্বীকার করে নেন। আমার মনে হয় এখানেই হল তার কবিতার বিরোধ, এই হল দুই মেরুতে বিচরণ। আবার এই দুই মেরুতে বিচরণ করার সময়ও কিন্তু 'গীর্জের চূড়ো'র মতো চমৎকার কবিতা আমাদের উপহার দিতে কার্পণ্য করেন না।

সময়ের অভিশাপ ও আশীর্বাদ দুই-ই তিনি নিতে চান। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুই-ই তার লক্ষ্য। সজল ঠিক তার অগ্রবর্তী কবিদের কাছ থেকে প্রেমের বিরূপতা গ্রহণ করেন নি। অতি সরল ও সহজ উত্তেজক লাইন লিখে আসর মাৎ করতে চান নি। বরং প্রেমকে তিনি দেখেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। কয়েক ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে তিনি হয়ত প্রেমের মধ্যেই চান তার সকল সংকটের অবসান, সমস্ত বিরোধের মিলন। গীতিময়তায় প্রেম ও প্রকৃতি, জীবন ও স্বপ্ন এক হয়ে যায়।

কখনও যদি ফোটাই ফুল কখনও ভালবাসি
আমায় মনে রাখিস নদী, আমায় কাছে ডাকিস
বাজিয়ে দিস্ ছেলেবেলার সাপ খেলানোর বাঁশি
প্রবাহে তোর লক্ষ ফণা ঢেউয়ে তীব্র শিস্।

আর এই আর্তির কারণ সম্ভবত

বিশ্বাস করো এখানের কোন দৃশ্য
আমাকে দেয় না এক লহমারও সুখ
আমার বাগানে গুল্মের আজ নিঃস্ব।

কিন্তু আশার কথা হলো এই যে সাফারিং ডাজ নট লাষ্ট বাট হ্যাবিং সাফার্ড লাস্টস ফর এভার। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'তৃষ্ণা আমার তরী' সজলের প্রথম কবিতার বই। বেশ কিছু দিন হলো তিনি কবিতা লিখছেন এবং মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনও। তার কবিতার এই সংকলনটি হয়ত কবি চরিত্রের প্রথম দ্যুতি হিসাবে স্বীকৃত হবে। ভাল মন্দের বিচার করতে পারে একমাত্র সময়। তাই সেকথা আলোচনার বাইরে রেখে নিদ্বিধায় বলা যায় যে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ সৌখিন কবি নন। কিংবা কোন সাময়িক উচ্ছ্বাস তার কবিতার উৎস নয়। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধান করতে চান, আত্ম আবিষ্কার করতে চান। লঘুতার যুগে এই লক্ষ্য অভিনন্দনযোগ্য। আশা করি কবিতার উৎসাহী পাঠকেরা 'তৃষ্ণা, আমার তরী'তে স্নিগ্ধ হবার মতো কবিতা পেয়ে খুশি হবেন।

তৃষ্ণা, আমার তরী : সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরাস, কলিকাতা-২৯, দাম—দু টাকা।

কবিতা পরিচয় সম্পর্কে
শুভাশিস গোস্বামী

সম্পাদকমশাই যখন আমাকে বললেন, "আপনাকে একটা দায়িত্ব নিতে হ'বে। 'কবিতা-পরিচয়ে'র একটা আলোচনা লিখে দিতে হবে"—তখন ব্যাপারটা আমার কাছে—'দায়িত্ব' বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটি টীকা যোগ করেন; 'অবশ্য প্রশংসাই করবেন'—এটা আমার কাছে বাহুল্যই ঠেকেছিল। কেন না প্রশংসা হয়তো আমি করব, হয়তো কেন নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তা সম্পাদকের নির্দেশনামা মানবার জন্যে নয়, নিজের দায়িত্ব পালনের তাগিদেই। অন্তত যে ভাষার সমালোচনা-সাহিত্য এখনও পর্যন্ত পেরামবুলেটরে শুয়েই দিন কাটায় সেখানে হঠাৎ কোনক্রমে কষ্টে সৃষ্টে অল্পবিস্তর সাবালক চেষ্টা দেখতে গেলেই আশ্বস্ত হবার কারণ ঘটে। আমার মতে 'কবিতা-পরিচয়' বাংলা ভাষায় কবিতা-সমালোচনার বন্ধ-জলাভূমিতে একটি প্রাণসঞ্চারকারী উদ্ভিদের মতো।

আসলে আমরা অনেকেই হয়তো এমন একটি পত্রিকার কথা ভাবছিলাম বা চাইছিলাম। কিন্তু পরিকল্পনার বাস্তব চেহারাটি যেহেতু স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছিল না—অতএব তা এতদিন অবহেলিত ও বিলম্বিত হয়েই ছিল। এই দুরূহ দায়িত্বটি পালন করার জন্যে অবশ্যই 'কবিতা-পরিচয়ের' সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ধন্যবাদার্হ। বিশেষত বাংলাদেশের তাবৎ বাণিজ্যিক, অভিজাত এবং বুদ্ধিজীবী সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলিতে যখন সমালোচনা মানেই প্রায় পারস্পরিক পিঠ চাপড়ান কিম্বা এ্যাকাডেমিক মাষ্টারি কিম্বা বুদ্ধিবাদের ধোঁয়াটে চচ্চড়ি এবং তাতেই যখন বাংলাদেশে সাবলীল প্রতিপত্তি সম্ভব, তখন সেই গতানুগত পন্থার পরিপন্থী কাউকে দেখলে আমাদের বিস্মিত, এমন কি ঈর্ষান্বিত হওয়াই সম্ভব। হয়েছেও তাই। পত্রিকাটির পরিকল্পনা ও আন্তরিকতার দিকে কিছুমাত্র না তাকিয়ে অনেকেই কটূক্তি করতে ব্যস্ত হয়েছেন। এসব দেখেশুনে নৃত্যভঙ্গির অপটুতা-হেতু উঠোনের অবয়ব সম্পর্কে যাঁরা অভিযোগ করেন তাদের কথাই ভাবতে ইচ্ছে হয়।

কবিতা-পরিচয়ের সম্পাদক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন: আধুনিক কবিতা-পাঠে সম্ভাব্য সহায়তার প্রয়াসে পরিকল্পিত কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন' তাঁর পত্রিকাটি। তিনি বলেছেন 'কবিতা পাঠে সম্ভাব্য সহায়তা'—অতএব কোন আলোচনা আমাদের কাছে তত convincing মনে না হ'লে তিনি আমাদের বিরুদ্ধতা করারও সুযোগ দিয়েছেন। এই ভাবে আলোচনা ও প্রতি-আলোচনার ভিতর দিয়েই একটি ভালো কবিতা কত বিভিন্ন রকমে ভালো তাকে বুঝবার সুযোগ দিয়েছেন সম্পাদকমশাই। তাই কবিতা-পরিচয়ের 'আলোচনা' বিভাগটিও আমাদের বিশেষ কৌতূহলের দাবী রাখে। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত স্বচ্ছ আলোচনার পরিবর্তে 'কবিতা-পরিচয়ের' পাতায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' এবং 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার সমালোচনা পদ্ধতি নিয়ে শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীআবু সঈদ আইয়ুবের মধ্যে যে শীতল যুদ্ধ ঘটতে দেখলাম তা আমাদের কাছে নিদারুণ অস্বস্তিকর লেগেছে। বিশেষত শ্রীশঙ্খ ঘোষের বিনম্রবচনের উত্তরে শ্রীআয়ুবের অসহিষ্ণু মন্তব্য নিতান্ত পীড়াদায়ক।

'কবিতা-পরিচয়ের' আলোচনার উপজীব্য সম্পাদক-নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ এবং তৎপরবর্তী কোন কবির একটি ভালো কবিতা। আর তার আলোচনা করেন বাংলা দেশেরই প্রতিষ্ঠিত কবিরা। ফলত আমরা আলোচনার একটি

উচ্চ মান আশা করতে পারি। এবং সেই দায়িত্ব সম্পাদকমশাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নির্মমভাবে পালন করছেন সেটা পত্রিকাশরীর দেখলেই বোঝা যায়।

কবিতাকে কবির জীবনী, দর্শন তথা তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে সনাতন রীতিতে ধোঁয়াটে কথাবার্তা না বলে, কবিতাকে তার নিজস্ব মূল্যে, প্রতিটি শব্দের নিজস্ব অভিধায়, বিন্যাসগত তাৎপর্যে, প্রায়োগিক কুশলতায়, ছান্দোসিক কারুকার্যে চিনে নেওয়ার এই বিশেষ রীতিটিকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং বাংলাদেশের ক্ষণপরমায়ু পত্রিকাগুলির মতো 'কবিতা-পরিচয়' যাতে তাদের পথানুসরণ না করে তার জন্যে সচেষ্ট হওয়া সমস্ত বাঙালী কবিতা-পাঠকের এবং কবির যৌথ দায়িত্ব বলেই মনে করি।

একটি গুলির শব্দে

সংবিধানন্দ পাঠক-চৌধুরী

১৩৭০ থেকে ১৩৭৩ সালের মধ্যে লেখা বাসুদেব দেবের ষাটটি কবিতার সংকলন 'একটা গুলির শব্দে' বাংলা কাব্যের জগতে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সামাজিক জীবনে যখন পোষাক সর্বস্ব চটুল অভিব্যক্তি প্রকট, বই-এর গায়ে যখন বহুমূল্য চোখ ধাঁধাঁই অলঙ্করণ ভেতরের দেউলেপনা গোপন করার বহুমূল্য বিজ্ঞাপন পাঠককে প্রতারণা করে ঠিক তখনই বাসুদেব দেবের সুস্থ-সুঠাম বক্তব্যের কবিতাগুলো, হ্যাঁ, গুলিবিদ্ধ যুগের শব্দবাহী অভিপ্রকাশ পাঠকের দরবারে কবি-হৃদয়ের দূত। ঝরঝরে ছন্দের সাবলীল এবং আটপৌরে শব্দের চোখা চোখা কথাগুলোই শুনিয়ে দিতে চান বাসুদেববাবু—

> অসহায় মনে হয় রক্ত মাংস কামনা ইত্যাদিকে
> পুনর্জন্মে বিশ্বাস শিথিল।

কিংবা,

> বন্ধুগণ, এখনো সময় আছে—
> প্রেমিকার গাঢ় কেশ স্তবক শিথরে
> একটি রক্তিম ফুল প্রতিশ্রুত—ভুলো না ভুলো না।

অতি আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকদের অভিযোগের মাত্রা এত বেশী যে, কবিতা ব্যাপারে বস্তুতঃই তাঁরা উদাসীন, বলা যেতে পারে উন্নাসিক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, কবি যুগজীবনের প্রতি উদাসীন থেকে আর যা-ই হোক কবিতা রচনা করতে পারেন না; শুধু কবিতা কেন, কোন সুকুমার শিল্পই যুগজীবনকে অস্বীকার করে রচিত হতে পারে না। আমাদের সমকালীন যুগ যখন জলবৎ তরল নয়, যখন তা বেশ কিছু পরিমাণেই জটিল, কবিতাও কিছুটা জটিল মানসিকতার অভিপ্রকাশ হতে বাধ্য। তাই কবিতা জটিল হয়েছে অভিযোগ সব ক্ষেত্রে অচল—এবং মস্তবড় নিন্দুকও ষাটের কবিদের হাতীর দাঁতের প্রাসাদবাসী বলতে পারবেন না। একটু মনোযোগী হলে কবিতার মধ্যে প্রত্যেকেই আত্মপ্রতিকৃতি লক্ষ্য করতে পারবেন বলেই কবিরা মনে করেন। কবিতা তাই কবির আত্ম-উন্মোচন হলেও অবক্ষত, হতাশাগ্রস্ত, ক্ষুব্ধ, ও ক্রুদ্ধ যুগজীবন সত্তার আত্মমুক্তির মাধ্যম বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে দিলে অসঙ্গত হবে না, যেহেতু এ যুগটা 'ডিভিসন অব লেবার এবং স্পেশালাইজেশানের যুগ', কোন একক কবির মধ্যে একটা 'সমগ্রতা' পাওয়া সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথের মতো। এক গোছা কবিমানসিকতার সামগ্রিক অভিব্যক্তি হিসেবেই কবিতা পাঠের অভ্যাস নির্ভর রসের প্রতিষ্ঠা। এবং এই দিক থেকেই বাসুদেব দেবের কবিতা উত্তেজক রংমশলা ছাড়াই একটা বিশিষ্ট মনোভঙ্গিমায় অনবদ্য!

বাসুদেব দেবের কবিতার মধ্যে যুগলক্ষণের নানা দিকই ধরা পড়েছে। আছে এ যুগের একচেটিয়া হতাশার কথা—আছে মর্ম-উষর ভয়াবহ বেদনার কথা—

> 'ভয় লাগে এ সময়ে খাখা প্ল্যাটফর্মে আর কিছু নেই, সারাদিন,
> উচ্চাশা, আদর্শ, প্রেম, যৌবন নামক সব দ্রুতগতি গাড়ীর প্রস্থান।

তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রতারণা, পকেটের তাস উল্টে দিলে দিব্য রঙিলার মুখ।' আর তার ফলেই তিনি বলেন—

> 'আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে এক নিষ্ফল বিষাদ
> একমাত্র পুত্রহারা নিরালম্ব বিধবার মত।'

কিন্তু সচেতন কবি কিছুতেই দমে যাবার পাত্র নন, প্রতিরোধের সপথে স্বোচ্চার তাঁর কণ্ঠ—'চিনি তোরে চিনি রে ডাকিনী

> রাত জেগে সব কটি লণ্ঠন জ্বালাতে তবু আমি'

কবির বলিষ্ঠ বক্তব্য মাঝে মধ্যেই পাঠককে উচ্চকিত করে:

'অদূরে দিগন্তে কার প্রাচীন প্রাসাদ পুড়ে যায়/এ হৃদয় জতুগৃহ। অন্ধকার ত্রিশূলের মত/সে যাদু প্রদীপ নিয়ে ফিরলে না তোমরা এখনও,/উদ্দীপনাময়ী শিখা বুকের ভিতরে রেখে জ্বলি।' আর এই জ্বলুনিই কবিকে গড়ে দেয় উজ্জ্বল আশা ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা—

শিশিরে ভিজিয়ে পা, কুয়াসার মাঠ ভেঙে এসে
শিউলির মত হাসি শিশুমুখে, মায়ের মমতা
ধান ক্ষেতে শিশির ও নারীর লাবন্য···ফিরে পাবে।'

সমাজ সচেতন কবির কবিতাগুলোর মধ্যে থেকে একটা প্রগতিশীল মনোভাব আমাদের কাংক্ষিত সত্যের দিক থেকে মুখ ফেরাতে দেয় না। কবিতার জন্যে কবি কোন 'ভাড়া' বাঁধেননি। তার সুন্দর চিত্রকল্পগুলো সাবলীল ভাবেই তার বক্তব্যের বাহন। কোন সিম্বল বা রূপকল্পকেই লজেঞ্জুসের মতো চুষে চুষে রসগ্রহণ করতে হয় না; একেবারে স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণভাবে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' আঘাত করে—

'পাশের ঘরেই কে নারী উপুড় হয়ে কাঁদে
দু'বুকের ভারে তার বন-কেতকী মরে যায় বিনা অপরাধে।'

আর এই জন্যেই প্রতিবাদের কবিতা রচনার জন্যে কবি জীবনবাবুর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, 'একটি মাত্র কবিতা লেখার জন্যে কিছু আয়ু মঞ্জুর করুন।'

সমাজ চেতনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমীক্ষা এবং জীবনকে ভালোবাসায় জয় করবার সুস্থমানসিকতার মিলনে নির্মিত বাসুদেব দেবের কবিতা আমাদের কেবল ভালোই লাগেনি উদ্দীপিত করেছে। খুঁত বাছার দায় আমরা আপাতত বৃহত্তর পাঠক সমাজের ওপরই দিতে চাই। এখনো তাঁর রচনা সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে রায় দেবার সময় হয়নি। তাঁর নিজের বাক্যেই প্রকাশিত—যত দিন না 'একটা কবিতা' তিনি লিখবেন ততদিন তাঁর কবিতা রচনার বিরাম হবে না—বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে খুবই আশা করতে পারে।

একটা গুলির শব্দে : বাসুদেব দেব। প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুক শপ। দাম দু টাকা।

এখন বৃক্ষ পতনের আবহ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পৃথিবী ক্রমশই যেন গলিত মাংসপিণ্ডের মতো
দলাপাকানো বস্তু হয়ে উঠছে। এখন
দিকে দিকে বৃক্ষ পতনের আবহ। পৃথিবী

একদিন হয়তো ছিল নারীর অস্তিত্বের মতোই
মর্মরিত, সঞ্চরণশীল, দৃশ্যত
মুগ্ধতায় সৌন্দর্যস্তূপের অভিব্যক্তি;
যেন বুকের স্তনদ্বয়ে নাভিমূলে গ্রীবায়
যৌবন লাবণ্যের ঢল
একটি পরিচ্ছন্ন পাহাড়ী নির্ঝর,
আর একদল মানুষ পাহাড়ের নীচে
গাছের কাছে ঝর্ণার পাশে
সৌন্দর্য আর আনন্দের চেতনায় অবগাহন করবে বলে
সরল কর্মতৎপতায় স্পন্দিত।

আমি সেইসব মৌলিক উপাদানগুলোকেই
সরলতায় সহৃদয়তায় একটি গোলাপের
সুন্দর উন্মেষের মতোই সঙ্গোপনে
বুকের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে চেয়েছিলাম;
পাহাড়ের গুহায় অরণ্যের গভীরে ঝর্ণার ধারে
হাজার বছর আগে যারা পাথর ঘষে ঘষে
অন্ধকারকে আলোকিত করতো, শাণিত শিলায়
সাংঘাতিক বাহুবলে ছিন্নভিন্ন করতো
আক্রমণোদ্যত জন্তুর উদর, অথচ প্রেমে
তেমন কোনো অস্থিরতা ছিল না, যেন প্রেম
একটি সজ্জিত উপাদান মাত্র, সমগ্রতা নয়।
সেইসব জন্তুর উদরের অস্পষ্ট দৃশ্যগুলি
এখনকার সুন্দরী রমণীদের উদরের নগ্নতাকে
কেন যে বার বার মনে করিয়ে দেয়। এবং

এখনকার যুদ্ধ রক্তপাত দাঙ্গার তোরণে
কোথায় যেন অপরিশ্রুত যৌনতা
ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের মতোই
আন্দোলিত হতে থাকে। চারদিকে এখন
দ্রুত বৃক্ষ পতনের শব্দ। বৃক্ষ পতনের বিষাদ ভিন্ন
অন্য আবহ নেই। পৃথিবীর বৃক্ষগুলি ক্রমে ক্রমে
পাতা শূন্য হয়ে আসছে, এখন নারীর
জঙ্ঘায় শ্রোণিতে উদরে মধ্যমায়
বৃক্ষের বৃন্তহীনতার প্রতিভাস, যদিও দৃশ্যত,
শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন বড়ো রমণীয়, এবং
চারদিকে নিশাচর বাজের মতো প্রেমিক-পুঙ্গব
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে সৌন্দর্যের দুর্গকে
উন্মত্ত ষাঁড়ের শৃঙ্গ প্রয়োগের মতোই হিংস্রতায়
নিমেষেই ভেঙে দিতে চায়। এখন পৃথিবী

ক্রমশই গলিত মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে উঠছে,
মৌলিক উপাদানগুলো অনেক আগেই ভস্মীভূত।

অনেক ভিড়ের মধ্যে
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেক ভিড়ের মধ্যে মৌন সুবিশাল।
মৌনতায় আমরা ডুবছি শব্দের সমুদ্রে উচ্চকিত,
অথচ একটিও শব্দ মগজে ঢুকছে না। দেশকাল
পরিপার্শ্ব ভোলা যায় না; তথাপি সময়কে সময়ের
উপকণ্ঠে রেখে দেখছি, বিরাট ক্যানভাসে আমাদের
মুখচ্ছবি এলোমেলো মুখোশের মতো অনায়াসে
কেন্দ্রাতিগ গতি নিয়ে তবুও কেন্দ্রের আকর্ষণে
ছুটছে, পথে দেখছে লোভনীয় অনেক আলোর বৃত্ত,
ভালোবাসার ত্রিভুজে কি বহুভুজে, ছায়া ফেলছে মনে।

আমাদের শোণিতাক্ত মনের ক্যানভাসে প্রতিভাসে
প্রতিবিম্ব পড়লেও প্রাচীন দ্বীপে স্তম্ভ ও মিনার
পাশে রেখে যেমন জনতা হাঁটতো উৎসবে কি শোকের যাত্রায়,
আমরাও আকাশ নক্ষত্র দিশা কিংবা পিপাসার
আরেক জগৎ থেকে পাড়ি দেবো আলোতে কি অন্ধ তমসায়।

খাঁচা
সুনীলকুমার নন্দী

সামান্য শৌখিন ইচ্ছে,
বাঁধাপথ দূরে রেখে দিগন্ত-মেলানো মাঠে
এলোমেলো ঘোরা—
ঘুরে ঘুরে মধ্যরাত্রি···ঘাস-গাছালির গন্ধ ··বাতাস মউমউ···

কেন ঘুরি না-জেনেই ফিরে ফিরে আসি—
অপার সবুজে-ঢালা ধু-ধু মাঠ দিগন্তে-হারানো,
ইতস্তত
ইট কাঠ চুণ বালি রড বীম
ছড়ানো সিমেন্ট,
যায় আসে কত লোক গা-বাঁচিয়ে
বাঁক ঘাড়ে, মাথায় কলস···

চল্‌তে চল্‌তে চোখ ফেললে পথের দু'পাশে
অমন ইট কাঠ চুণ বালি রড বীম
ইতস্তত, ছড়ানো সিমেন্ট
দেখা যায়; ওরা কিন্তু
সামান্য কাঙ্ক্ষিত ঢেউয়ে আড়াল ফেলে না।

হঠাৎ চোখ কচ্‌লে একী,
কোথায় সে ধু-ধু মাঠ

ইট কাঠ চুণ বালি রড বীম ইতস্তত, ছড়ানো সিমেণ্ট ?
লাল নীল শাদা কালো হলুদ বেগুনি জাফরি
অসংখ্য বসন
উড়িয়ে প্রলুব্ধ করছে : এসো
আর একটু এগিয়ে এসো জংলা ঘাস থেকে···

সাবধান, আর একটু এলে রহস্যে আড়াল-টানা
সেই ঘর বাড়ি—
একই গাছে ঘোরে ফেরে দিগন্তের নীল-খোলা বশংবদ পাখি !

যেমন সুন্দর জানে
শঙ্খ ঘোষ

শারীরিক অভিমান
খুলে নাও

তোমার বুকের কষ্ট, অস্ফুট শব্দের স্নান
রাত্রিবেলা, ঘুমের ভিতরে বন্ধ বাড়ির সদর
খুলে নাও

আর এই উপত্যকা ঘটায় কুয়াশা
কেবলই অভ্যস্ত পথে ঘোরানো পাহাড়ী বাসা
ছিল বা ছিল না এই মুহূর্তেই মনে রেখো বন্য নগরীর
দারুণ শরীর
আর সব অভিমান তোমার বুকের কষ্ট
এবারের শীতে
খুলে নাও

যেমন সুন্দর জানে সমস্ত শরীর খুলে দিতে।

চিরস্থায়ী মেঘমালা
শিবশম্ভু পাল

মেঘমালা ভালবাসি, কেননা মেঘের স্তর
তোমায় প্রচ্ছন্ন করে আছে
কেননা তোমার জন্য ভালোবাসা ভয়
পরস্পর বিজড়িত শাখার মতন উঠে
নভোতল স্পর্শ করে যায়।
তুমিতো যেখানে থাকো সেই এক অগম গোপন
মেঘের ওপারে। আমি যাবোনা তোমার অঙ্গে, ভয়।
ওখানে ফুরিয়ে গেলে ফুরাবে সকল বনরাজি।

বরং দুচোখ ভরে আমাকে দেখাই ভালো, ঢেউ
ওঠে নামে সংগোপন সমুদ্রে আমার
বাহিরে স্তম্ভিত মুগ্ধ প্রেমিকের দেহ যেন চন্দ্রস্নাত তাজ।
জ্যোৎস্নার জন্মস্থান, তুমি থাকো চিরদিন অগম গোপন
মেঘের ওপারে।

বার্লিনে, তোমার চিঠি
দেবকুমার বসুকে
কুশল মিত্র

দরজায় টোকা পড়লে প্রতীক্ষিত কণ্ঠে ডাকি—"এসো" !
বিদেশের ছোট্ট ঘরে বিদেশিনী প্রিয়তমার মত যদি কেউ
একাকীত্ব ভেঙে দেয়, চেয়ে দেখি—আকাশে জেটের আওয়াজ
ঘনীভূত বাষ্প-রেখায় নাম লেখা মেঘেদের খামে
দুয়ারে তোমার চিঠি, বন্ধু, কতকাল পরে টোকা পড়ে
স্মৃতির দরজায়। আজ হেমন্তের বনে বনে পাতারা রঙিন,
অন্য কেউ হলে আমি, বলতাম—সময় নেই, যাও। এই রং ধরার বেলায়।
কিন্তু আজ ঝরা পাতার দিনে আমার অনেক সময়। তাকে ডাকি,
বলি, বসো। উঃ ! কতকাল পর দেশান্তরী জীবনের ঘরে
তুমি এলে, বন্ধু, আজ তোমার চিঠি যখন পেলাম।

তোমার চিঠির ভাষায় মনে পড়ে আমাদের পৃথিবীর ক া—
সব শব্দ, উচ্চারিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব আন্দোলনে,
বন্ধু, প্রেম, ভালবাসা, গেরুয়া নদীর জলে কিশোরীর হাসি
অনেক জীবন্ত ছিল আজকের চেয়ে। যে পৃথিবীতে যন্ত্রণা, চিৎকার
জৈবিক প্রয়োজন বোধে সুরু যার আলো নিভে গেলে
চাল, ডাল, তেলের দাবী—যত আন্দোলন, বন্ধ বন্ধ, যদিও বা
প্রতিবাদে অর্থ আছে, নেতাদের দেশরক্ষা ডাকে, আজ
সে পৃথিবীর নাগরিক আমি হঠাৎ নতুন ঠিকানায়
নিজের উৎসের খোঁজে বাসা বাঁধি প্রকৃতির জরায়ুর দেশে।

হাফেল নদীর তীরে আজ যেন কার সাথে ভেট ছিল, ভুলে যেতে চাই।
নতুন পৃথিবীর কথা—সূর্যালোক, তোমার চিঠি, এখন
সব আমার প্রতিবেশী, জলপ্রপাতের গান দূরের পাহাড়ে
পাশ-ফেরা অন্ধকারে মুগ্ধহাত নগ্ননারী পাহাড়ী শরীরে
প্রতিদিন ঘুমে যার সুন্দর মৃত্যুর রূপকথা, তারপর
"ভালবাসি, ভালবাসি" দুই নগ্ন মানুষের ভীষণ চিৎকারে—
যখন সব অপরাধ ক্ষমা পায় ভালবাসার নামে
আমি দেখি এই সব কথা আজ প্রতিবেশী আমার। ঠিক তাই
প্রতিদিন জাগরণে আমার জীবন—আলো, যখন মুক্তি
চেয়ে দেখি আকাশের ফেণায়িত মেঘে নারীর দেহের স্তনদেশ
দুধে দুধে বিপুল মধুর আলোর আকাশে যৌবন
আলো, আলো, আলো, বন্ধু, তোমার চিঠির প্রতিবেশী
আমি, তোমার স্মৃতির। যদি অনুভবে টোকা পড়ে, দেখি—
বন্ধু, তোমার চিঠির কথা হাজার জনের চেয়ে অনেক বড়।

বিবর্তন

মানস রায়চৌধুরী

স্বপ্নে মুখ ধুয়ে নিয়েছি। এখন তোমার সঙ্গে কথোপকথন হবে শৈশবের মতো।
চতুর্দিকে এতো নিস্তব্ধতা—চোখের পাতার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় কুঁড়িটির
আমার দৃষ্টির সুচ পড়ে গেলে সেই শব্দে তুমি চমকে ওঠো।
এই বর্ণনা-অতীত স্তব্ধতায় থেমে থাকা হৃৎপিণ্ডে
অন্তরালবর্তিনীর নিঃশ্বাসের সাময়িক বিরতির বিদ্যুৎ আড়ালে আমি কথা কই
কথা শুধু তোমার উদ্দেশে
কতো যুগ বাদে এলো এমন আনব-ভালবাসা। কেন্দ্রে যেন চমকায়
শৈশব দৃষ্টির পাশে আগ্নেয়কণার ঘূর্ণীতাপ
পৃথিবী দ্বিখণ্ড হয়ে যায়, স্বপ্নে মুখ ধুয়ে আমি নূতন সিঁড়ির মধ্যে
পায়ের ছাপ না রেখে পাখির লঘুত্বে নেমে যাই
এতো ভারহীন, এতো সমর্পণে কেন্দ্রাতিগ আমার শরীর
তোমার সঙ্গেই হবে কথোপকথন
বারো বছরের সম্ভাবনা, যেন দীর্ঘ বনস্পতি—প্রতিটি শাখায় ছিল ব্যগ্র মেলে থাকা
প্রতিটি বাহুই যেন শাখার প্রতীকে ছিল রহস্যের আলিঙ্গনে বিপুল প্রত্যাশী
চতুর্দিকে নৈসর্গিক দ্যুতি, নীচে দৈনন্দিন অন্ধকার, পাখি ও পথিক,
শব্দে উচ্ছ্বল ক্রেতা ও বিক্রেতা···
দীর্ঘদিন ধরে আমার জীবন ছিল অশ্বরূপ অশ্বত্থের মতো
গ্রাম চলে গেছে আমার শরীর দিয়ে শহরের অটোমবিলের নেশা
আর ঐ গরুর গাড়ীর চাকা হাত ধরাধরি করে গেছে দুর্ঘটনায়।
এইসব বাস্তবতা, মৃত্তিকা মাখানো মলিনতা, পায়ের নীচের কাদা;
পুরোন পয়সার মরচে, গুপ্ত সিন্ধুকের অন্তর্লীন বেনারসী রেশম ও কিংখাব
অনুভব করে দেখে ভীষণ পার্থিব মনে হয়।
স্বপ্নের আঁশও লেগে নেই শরীরে আমার
বড়ো ভয় হয়েছিলো কীভাবে তোমার কাছে যাবো
কোন প্রবেশাধিকার আছে, সঙ্গীত? তুলিকা? মেধা?
কোনো অনন্তের রেখা ছিলো না আমার—
একমাত্র ছিলো নিদ্রা যার মধ্যবর্তিতায় প্রায়শঃ তলাতে পারি
শতসিন্ধু তলদেশে অগম সত্তার গূঢ় নিঃসঙ্গ গোপনে
সেইখানে নেমে যাই, স্বপ্নে মুখ ধুয়ে আসি, তারপর কথোপকথন হয়

শিশুর শুভ্রতাভরা প্রথম নগ্নতামাখা আনকোরা শব্দের চুম্বনে
অধর যেভাবে জেগে উঠে ওষ্ঠের সামান্য তাপে
সেভাবেই ভাষার উদ্ধার চলে তোমাতে আমাতে
এই এতদিন বাদে যেন জীবন আমাকে দিল বাঁচার দাক্ষিণ্য আর
সৃষ্টির আতিথ্য-ভরা উত্তরণ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে।

স্বপ্নে মুখ ধুয়ে নিয়েছি
এখন তোমার সঙ্গে সবকিছু বিনিময়, সমবায় স্বাভাবিক হবে।

আমন্ত্রণ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

নিকটে যাবার আগে বেলা যায়···নিকটে যাবার বড় প্রয়োজন ছিল
নিকটে যাবার প্রয়োজন
নিকটে যাবার কষ্ট জানিবার পূর্বে বহু বেলা যায়।

কাতরতা ছিল কাল, দীর্ঘ অভিযোগ, আজি বেলা নিষ্ক্রিয় মাতাল
পারাবতগুলি সব জ্যোৎস্নালোকে গিয়াছে হারায়ে
এখন গোলাপবনে আমারও কি প্রয়োজন···এখন গোলাপ কারে দেবো
এখন আধারে যাবো কুসুমের দোকান পেড়িয়ে
এখন পাতালে যাবো পরিচিত দরোজাগুলি করাঘাত করে
এখন আগুনে আমি ঝলসে নেবো রমণীর মসৃণ উদর
এখন স্বপ্নের জন্য···এখন মৃত্যুর জন্য প্রতিদিন কালীঘাটে যাবো।

বিফলে ভরিয়া দেবো গহ্বর গোলাও
রাশি রাশি মেদমাংসে, অহরহ প্রকৃত শূন্যতা
ছিঁড়ে ফেলব তীব্র নখ পিশাচের প্রায়
প্রতিবক্ষে স্বাভাবিক হত্যাকারীদের রক্ত, উন্মাদক আত্মাগুলি থাকে
অতএব সুদূরতা জানা হল ছিন্ন হয় ভয়ংকর পদাঘাত লেগে
নিকটে যাবো না বলে··নিকটে যাবো না তাই অবেলায় অতর্কিতে রক্তবৃষ্টি হয়।

প্রতিদিন বক্ষজুড়ে নিকটে যাবার আন্তরিক আমন্ত্রণ শুনি
প্রতিদিন অন্ধকার পলাতক পরীদের নৃত্যে ভরে থাকে
প্রতিদিন রোমাঞ্চিত অস্থিগুলি আলিঙ্গনে পর্বতশিখর হতে চায়
প্রতিদিন···প্রতিদিন নিকটে যাবার কষ্ট প্রতিধ্বনিময়।

নিকটে যাবার কষ্টে অসম্ভব কোলাহল করে উঠব আমি
নিকটে যাবার কষ্টে
অসম্ভব আর্তনাদ করে উঠব আমি
নিকটে যাবার মূল্য···নিকটে যাবার কষ্ট এতদিনে বহু জানা হল।

আলনার কাছে অসুখ

সুধেন্দু মল্লিক

আলনা ভর্তি শরীর আমার
শরীর দিয়ে কাপড় ঢাকছি।
নিরাবয়ব নিশ্বাসে ঘা বাজছে তোমার
গ্রামোফোনের লম্বা চোঙায়
গান শুনিয়ে গান শুনিয়ে।
ফুল খুললে হলুদ জমি, হলুদ ফোঁটায় ছোট্ট শহর
কোন্‌টা আমার বাড়ি বলতো।
বল্লে দেবো একশো মোহর, তিনশো মোহর!
মোহরে কোন লোভ নেই-তো!
সত্যি আমার মোহরই নেই।

তাহলে যাও। যাও বলতেই অগ্নি যাচ্ছো
তবে কে রঙ-মিস্তিরি নিমফলে
সুধা মাখাচ্ছো!
দেখি আমার কপাল মন্দ
ঢাকনা খোলা কৌটো বন্ধ
এলোপাথাড়ি ধাক্কা দিচ্ছি—আড়ি করেছো,
আড়ি করেছো!

কথার মধ্যে ধরছো কথা
পর্ববিভাগ ছন্দ যতি
পা ফেলতে না চোখে পড়েনা
তোমার ক্ষতি আমার ক্ষতি।
আল্‌না ভর্তি শরীর আমার, নাকি কাপড়?
কাপড় ফেলে শরীর পড়ছি
নাকি কাপড়?
চোখের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে হাজার দৃশ্য
পাতা পড়েনা হাজার বছর
অসুখ আমার দুশ্চিকিৎস্য।
দিয়ে গিয়েছো সাফা জবাব
ডাক্তার সাব, ডাক্তার সাব
তিনশো মোহর—কথা শোননা।
একশো বছর—হাজার বছর ঘুম ছিলো না
ঘুম ছিলোনা—ঘুম ছিলোনা।

পুরোনো প্রাসাদে তার নীল করতল

সুব্রত চক্রবর্তী

ফুলের কোরকে হাত,
মুষ্টিবদ্ধ পুষ্প তবু আপনার মহান আঁধারে
সঞ্চিত রেখেছে রেণু, বর্ষব্যাপী হাজার বছর।
নদীর আড়ালে বুক,
পুরুষত্ব মোচনের দাবী; আত্মায় তুষারপাত,
আঁভালাস, মরুদেশে লাল বালুঝড়।
বিস্তীর্ণ হৃদয় আজ সামুদ্রিক খেয়ালে রঙিন, দামাল বাতাস
বেয়ে উড়ে আসে কবুতর—অবসাদ ভুলি;
তোমারই প্রত্যয় টানে অভিলাস—
পুরোনো প্রাসাদ,
থামে যার টিঁকে আছে কবেকার

রাতুল অঙ্গুলি!
গোপনতা,
তুমি আজ কতদূরে রাজার দুলাল—
আলস্য বিস্মৃতি পাপ
জরা সক্রেটিসের পেয়ালা
স্থঠাম রেখেছো! আমি বারংবার পৌরুষ ভিঙিয়ে
যত দূরে যেতে পারি আরো দূরে—
অভিষিক্ত মালা!

নদীর আড়ালে হাত, ফুলের কোরকে বুক
অভিমানে কেঁপে উঠে স্থির;
অনুপরমাণু ঘিরে পুরুষত্ব মোচনের ছল।
হৃদয় মাড়িয়ে দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহী সমুদ্রবাতাস—
মহান প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়ো হয়, থামে যার ওম দেয় কবেকার
নীল করতল!

যুবতী বেশ্যার প্রতি

পরিমল চক্রবর্তী

১

'পুরুষেরা মূল্যবান' এ-কথা তোমার জানা আছে,
আমি জানি; কিন্তু ভাখো, পুরুষের সমস্ত শরীরে
আকাঙ্ক্ষার কতো বীজ যন্ত্রণায় উপ্ত হয়ে আছে!

যে-পুরুষ চলে যায় শুধুমাত্র এক রাত্রি থেকে
তাকেও কি মনে রাখো? তার কথা তবু মনে পড়ে
যখন আরেকজন কাছে আসে 'প্রিয়তমা' ডেকে?

হয়তো পড়েনা মনে; মনে পড়া প্রায় মূঢ়তার
মতো হবে বলে তুমি তাকে মনেও আনোনা;
অথচ জানোনা তুমি তার দুঃখ কী-তীব্র, অপার!

না জেনেই ভুলে-যাওয়া দোষ যেন তোমার স্বভাবে—
যেহেতু সোনার লোভে প্রিয়া হও বহু পুরুষের,
তাই কি পোড়ে না মন একজন প্রিয়র অভাবে?

২

অনায়াসে প্রিয়া হও একই রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন বহু পুরুষের।
বিবেকে বাধে না আর আজকাল,
একদা যদিও
রাত্রির গভীরে কোনো অজানিত পুরুষের স্বরে
ভয় পেতে, স্বচ্ছ মন কেঁপে উঠতো শঙ্কায় তোমার;
কিন্তু সম্প্রতি যেহেতু
এই বাঁকা ক্রুর পথে বহুদূর এগিয়েছো তুমি,
তোমার ভেতরে তাই আজ আর বিবেকের দংশন নেই।

তবুও জিজ্ঞাসা করি তোমাকেই, হে বারবণিতা,
যখন শিকার করো পুরুষকে, (যে-পুরুষ
পৃথিবীর প্রথম শিকার,) তখন কি কামান্ধ মনের
নিগূঢ় গোপন দেশে কোনো পাপ, কোনো জ্বালা
অনুভূত হয়না তোমার, যেমন কোনো নিন্দিত
অবিবেকী কাজ করলে আমাদের প্রত্যেকেরই হয়?

হয়তো হয়না;
অথবা স্থূল শরীরের সীমা ছেড়ে মানুষের মনের সন্ধান
এখনো পাওনি তুমি;
এবং পাওনি বলেই
আজো তুমি
অনায়াসে প্রিয়া হও একই রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন বহু পুরুষের।

৩

আর তৃষ্ণা জাগিওনা, কামতৃষ্ণা জাগিও না আর;
সমস্ত শরীরে ক্ষত, পুরুষাঙ্গ গলিত, অক্ষম।

শোনো হে স্বৈরিণী, তুমি আকাঙ্ক্ষার নীল মেঘনার
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সেই ক্ষুধা জাগিও না আর হিংস্রতম।

তোমাকে এ-দেহ দেই; দেহ দিয়ে যেন স্বর্গসুখ
পাই আমি তোমার ও শরীরের নিতল গভীরে;
গোপনাঙ্গ স্পর্শ করি, স্পর্শ করি সমুন্নত বুক—
তীব্র পিপাসার জল খুঁজে পাই তোমার শরীরে।

তবুও মিনতি করি সেই তৃষ্ণা জাগিও না আর।
দূরে যাও, দূরে যাও, হে দয়ালু রূপসী স্বৈরিণী
আমার পৃথিবী থেকে; কামার্ত চোখের বাসনার
তৃপ্তি নেই, আমি জানি; আমি জানি, হে রূপজীবিনী,
যৌবনের লালসার অন্ত নেই; তবুও তোমাকে
করুণ মিনতি করি মুক্তি দাও এবার আমাকে।

ম্যাজিক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দুঃখ চিরকালের কুঁড়ে
বসতে পেলে উঠতে চায়না
ভাবটা যেন ঘর-গেরস্থ
ঘর পেলে ঘর ছাড়তে চায়না।

এসব থেকে ভাল হাওয়া
ও-ই তো কেবল বোহেমিয়ান,
সারাটা দিন ঘুরি ওড়ায়
সন্ধ্যাবেলায় ম্যাজিসিয়ান।

চতুর্দিক বড় নিথর
অবিমৃষ্য পরিপাটি—
বাঁচায় কেবল যাদুকাঠি।
একটি দুটি আলোর টোকা
শূন্যতাতে পুতুল নাচে;
ম্যাজিক ছাড়া কিই-বা আছে?

রমণীর উপমা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটুখানি ভেবে দেখলে রমণীর শরীর মানেই পৃথিবী
জল ভাবলে জল, জাহাজের মতন ভাসতে পারো,
নোঙর করে দাঁড়াতে পারো মাঝ-সমুদ্রে
পাহাড় ভাবলে পাহাড়—
তুমি পিঁপড়ের মতন অধ্যবসায়ে উঠতে পারো,
স্তনবৃন্তের ওপর গেঁথে আসতে পারো তোমার পতাকাটি।
তার বাহুমূলে যোনিমণ্ডল মুখ ঘসলে শার্দুল-শাসিত অরণ্য
নিরুপম অন্ধকার, ঝিঁঝিপোকার শব্দ;
রমণীর শরীর মানেই পৃথিবী।

তার শুষ্ক কণ্ঠে মরুভূমির নরম বালুকা; জিহ্বার ভিতর
ঢুকে গেলে একটু জল—জলের ছলনা—তাতে তৃষ্ণা মেটে না।
আকাশ ভেবে তার চোখের দিকে চোখ মেলে রাখো, স্থির,
অমনি বৃষ্টি নামবে।
ওর দুটি ভ্রূর ওপর আরোহণ করলে প্রচণ্ড উচ্চতা
ঘর-বাড়ি দেখা যাবে না, নক্ষত্রের আলো পরে'
উঠে আসবে সন্ধ্যা।

তার ওপর যদি ভালোবাসার কথা তোলো, অমনি সেই রমণীর শরীর
পৃথিবীকেও ছাপিয়ে উঠবে। তোমার জাহাজ

নোঙর ছিঁড়ে ভাসবে, জলপ্লাবন হবে মরুভূমিময়;
তোমাকে উড্ডীন দেখে নক্ষত্রেরা নেমে আসবে সহচরীর মতন।
ভালোবাসার কথাই যদি তোলো তা হলে তো রমণী
আর শরীরে সামনে থাকেন না, শরীর ছাপিয়ে
ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে যান;
বাঁচার ইচ্ছে হয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েন,
সন্তান হয়ে চোখের খেলে 'বেড়ান, আনন্দ হয়ে
নৃত্য করেন;…

যেন স্তম্ভিত পরিব্রাজক ভ্রমণ করতে পারে
জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ পথ
অবলীলায়।
ভালোবাসার কথাই যদি তোলো,
রমণীকে এক পৃথিবীতে, একমাত্র জন্মে, বেঁধে রাখবে কে?

বাড়ি ফেরা

অনন্ত দাশ

বাড়িতে ফেরার আর কোন ট্রেন নেই।
ষ্টেশনের চতুর্দিকে যাত্রীদের ভিড়
সিগন্যালে সবুজ নির্দেশ
ধীরে ধীরে সব ট্রেন দূরে চলে যায়।

এখন সম্বল শুধু নৌকাখানি গঙ্গা পারাপারে
সকালে আজান আর প্রতি সন্ধ্যা জাহাজের সারি—
কিছু বন্ধু…কফির পেয়ালা
মধ্যরাতে ট্রেনের হুঁইসিল
কত যাত্রী
বাড়ি ফিরে যায়।

অথচ হৃদয় যেন
ট্রাফিকে আটকে থাকা বাসের ইঞ্জিন
সিগন্যালের সবুজ নির্দেশে
সব ট্রেন দূরে চলে যায়
আজকে আমার
বাড়িতে ফেরার কোন ট্রেন নেই।

মধ্যরাত্রির ভাষা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কে তোমার কথা শুনবে এমন মধ্যরাত্রে উমা।
আমি তো মানুষ নই, মানুষেরই বিবেক মানায়,
মানায় অস্ফুটে বলা, শরীর সরিয়ে রেখে বলা
অর্ধেক মিথ্যায় আর সত্যের অর্ধেক সমাহারে
তোমাকে অদ্যাপি আমি "ভীষণ" বিশেষণটির মতই
আপাদমস্তক ভালবাসি
কিন্তু ছাখো এখনো আমার দেহের ভিতর মন
মনের ভিতর
খুব বেশীদিন আর না বাঁচার ইচ্ছা,
মানুষই বাঁচতে চায় সর্বাঙ্গ সংগমে
স্বাস্থ্যে
উচিত ঔষধে ;
পৃথিবীতে নিশ্বাস নেবার মতো খাঁটি অক্সিজেন
ক্রমে এত কমে আসছে যে তাবৎ অরণ্যভূমি
তার বৃক্ষ সমাজের আত্মা থেকে নির্গত সুবাস
পাঠিয়েও মানুষকে আর শেখাতে পারছে না
চন্দ্রসূচনার মতো সৎসাহসী ভাষা।
এমন কি বৃক্ষ তার স্বীয় মৃতদেহের নির্মাণ
অর্থাৎ দরজা জানালা নিয়ে সভ্যতার অভ্যন্তরে

ঢুকে পড়েও এখন কেবল নিশিকুটুম্ব ছাড়া অন্য আর
কাউকেই আটকাতে পারছে না।
আমি তাই অন্যভাবে তোমাকে বাঁচাবো
যেমন মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের ভূমিকায় কুশলী ডাক্তার
খানিকক্ষণ নিশ্বাস জিয়ায়ে রাখে ;
আমারও যৌবনে আর আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই
তাই আজো ডাক্তার এড়ানো
আধঘণ্টা যুগল শ্বাসের যজ্ঞ, আধঘণ্টা
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম চুরি করা
সাময়িক সঞ্চারামে
বুকের বা পাশে প্রায় মধ্যপথে উঠে এসেও থমকে থাকে যম।
আমার অস্তিত্বে এরকম
সাবিত্রী আশ্বাসে থেমে থাকা
অজস্র মিথ্যুক রচনারা
যৌবন বাঁচিয়ে রাখে, যেহেতু এখনো
বহু প্রতিশোধ বাকী আছে,
অগ্নি-উপমান যত আত্মগ্রাসী দ্রষ্টব্যের ক্ষুধা আর ঝড়ের সমান
আমূল নাড়ানো প্রতিশোধে হাতে পেলে
সেদিন বিজ্ঞান কিংবা
দুকলম লিখতে না লিখতে ফুলে ওঠা সাহিত্যকে
হৃদয় হত্যার শোক দেবো।
কিন্তু আপাতত আমি আসন্ন পৃথিবী শুধু ভাবি,
শান্তিকে বাঁচাতে গিয়ে
পরমাণু শান্তিকে বাঁচাতে গিয়ে
জন্ম নিয়ন্ত্রিত সভ্যতা তখন একজন মানুষেরও নিশ্বাসের যোগ্য
ব্রহ্মচারী বায়ু বাঁচাতে পারবে কিনা
জানিনা, জানার তেমন বিশেষ ইচ্ছাও এখন
নেই। শুধু যম অপেক্ষায় আছে বলে
ধ্যানী বাসনার চারিদিকে
জন্মব্যবহার

ক্রত করে যেতে হয় ইন্দ্রিয়ের সীমিত ক্ষমতাগুলি কবিতায় জেলে।
আমারো দেহের ভিতরেই ছিল মন,
তাই
প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধিৎসায়
দেহের সমস্ত মৌন খুঁড়তে খুঁড়তে
হঠাৎ শিল্পের মতো, দুষ্প্রাপ্য হীরার মতো, প্রেম
কখনো সখনো শুধু ছুঁয়ে দেখতে পাই ;
যেমন এখন রাত্রির মিউজিয়মে
পূর্বাপরহীন কোনো দর্শক দাবীতে
তোমার প্রতিটি সবিশেষ রেখা ও ইচ্ছাকে আমার প্রতিটি
ইন্দ্রিয় ও ইচ্ছা দিয়ে ছুঁয়ে আছি,
ভ্রমর যেমন
শরীরের সুপ্তবিষ নিয়ে
ফুল ছুঁয়ে থাকে।
আমি বেশীদিন আর এইভাবে মধুহীন
তোমাকে ছোঁবো না ; ছাখো
আমার দুহাত থেকে স্পর্শ সরে যাচ্ছে,
শরীর দামামা হয়ে
যুদ্ধের সময় আর বাজতে চায় না।
আমিতো মানুষ নই, মানুষেরই বিবেক মানায়
তাই দীর্ঘ বাৎসরিক আয়ু নিয়ে যৌবন তোমার
টেনে বের করে
বাইরে জ্যোৎস্নার মতো
শীতে রেখে আসতে চাইছি ;
তারা জ্যোস্নায় ভিক্ষুক কিংবা
রৌদ্রে শুষ্ক হয়ে যাক,
আজ আমার কিছুই
আসে যায় না। কেবল তুমি,
বলো তুমি কি প্রস্তুত ?
তুমি কি প্রস্তুত ?

আমার অন্তিম হত্যা।
শব্দের ক্ষমার যোগ্য মালা করে
দ্বিধাহীন, ছন্দহীন, জন্মভয়হীন
তবে এসো তোমার ভিতরে ছেড়ে দিই।

নীলাম
গৌরীশঙ্কর দে

সব চেয়ে কম দামে সব থেকে মহার্ঘ জিনিস
বিক্রি হচ্ছে আজকাল, চতুর্দিকে রক্তের নীলাম,
ফুটপাথে অসহায় সমস্ত কবিতা নিয়ে কীটস,
মুছে গেলে ভালো হতো জলের হরফে লেখা নাম।

দু টাকায় পাওয়া যাচ্ছে খান তিনেক বাখ্—বেটোফেন,
কোনোদিন শুনতে পাবো হেঁকে যায় বিকেলে হকার
মূল্য মাত্র এক টাকা, প্রত্যুষের সমুদ্র নেবেন ?
বিকাবে জলের দামে, পোষ্টার পড়েছে অলকার।

নষ্ট চাঁদ
রত্নেশ্বর হাজরা

কাল রাত্রে আমার ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটা
গলে গেছে
আস্তাবলে ঘোড়াগুলো
পর্বত শৃঙ্গেরা
প্রস্তর নির্মিত পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতি। কাল রাত্রে
ফাঁকা মাঠে ভীষণ ভয়ের দৌড়ে বাজি রেখে
যে-যে ঘোড়াগুলো ছুটেছিল
গলে গেছে—যাদের যাদের

পালিয়ে যাবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল—
বাগানের লম্বা গলা আঠাশটা জিরাফ
নীল গাই
পেঙ্গুইন
ডোরাকাটা জেব্রা চিতা
কয়েকটা হীরকখনি—হিমালয় উজ্জ্বল লুব্ধক
কাল রাত্রে
ছাতিমের ডাল ভেঙ্গে চন্দ্র পড়ে গেছে
দেয়াল ঘড়িটা
ঘোড়াগুলো
পবিত্রতা। কাল রাত্রে
বায়ুকটি মানব শিশু জরায়ুর সংগে গলে গেছে।

সোনালি গির্জার চূড়া

গণেশ বসু

সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না,
পৌঁছনো যাবে না বুঝি কোনোদিন।
এখানে কেবল
রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে
সংখ্যাহীন মানুষের রক্তের ওপর দিয়ে
সংখ্যাহীন যুবতীর আকাঙ্ক্ষা মাড়িয়ে
বুনো গোলাপের স্বপ্নে বিমোহিত যুবকের বুকের ওপর দিয়ে
অন্ধকার সেতুর ওপারে।

কিন্তু কোনোদিন সেই মোরগ চূড়ায় আর পৌঁছনো যাবে না
খুঁজে পাওয়া যাবে না উজ্জ্বল গোলক
শুনতে পাবো না রোদের সংলাপ।
জানি আমি,

জমে যাবে বুকের উষ্ণতা,
কণ্ঠনালী বন্ধ হয়ে যাবে,
নিশিন্দা পাতার চোখ বিষণ্ণ সজল
চোয়ালের পাশ দিয়ে নদী হবে অনন্ত বঞ্চনা
সুবিপুল আর্তনাদে। দেয়ালের গায়ে
লটকে থাকবে শুকনো দেহটা
ভাঙাচোরা ফ্রেমের মতো।

সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায় কেউ পৌঁছতে পারে না
সেতুর ওপারে সব উঁচু নিচু পাহাড় ডিঙিয়ে
বুনো কাঁটা আর বিষাক্ত সাপের
হাজার হাজার সব প্রাসাদ মাড়িয়ে
থ্যাঁতলানো মানুষের হাড়ের ওপর দিয়ে
সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায়,
যেখানে রক্তের জলে সূর্য হেসে যায়।

সেখানে বুকের ভাষা রক্তপদ্ম
এবং সে প্রতিশ্রুতি শব্দের সম্ভারে
উজ্জ্বল
কৈশোরের আরক্তিম স্বপ্নের মতন।
এবং সেখানে আর অন্ধকার স্মৃতি সব জলেনা কখনো।
সেখানে সমস্ত মৃত মানুষেরা জেগে ওঠে পুরনো সকল
আর্তনাদ ভুলে যায়,
সেখানে সমস্ত মৃত প্রেমিকের মুখ ভাসে আশ্চর্য উজ্জ্বল।
এবং বিবর্ণ সব প্রেমিকার চোখ হয় সজল গভীর
বসন্তের গানে।

সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না,
সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় কেউ পৌঁছতে পারে না?

আরতির ধ্বনি

পরেশ মণ্ডল

এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল
আমি তাকিয়ে দেখলাম
মন্দিরের মতো
মন্দিরের চূড়ার মতো
ছায়া
শুনতে পেলাম
আরতির ধ্বনি
যেন
স্বপ্নের মতো ধূসর

এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল

ঘর

বাসুদেব দেব

তা হলে কি ভেঙে ফেলবো ঘর!
তুলবো একটা ল্যাম্পপোষ্ট,
নাকি, ল্যাম্পপোষ্ট ভেঙে
ডাকঘরের শুভ মহরৎ!
ফেলে রাখলে শুধুই আগাছা বাড়বে, কার্ণিশের বট
একদিন ঢেকে ফেলবে সব।

কি করবো ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে যায় ঘরে
আরো আসবাব বাড়ে, পার্টিশন, পর্দা···এই সব।
ল্যাম্পপোষ্টের জন্য কেনা বড়ো বাল্বটা বাতিল হয়ে যায়,
ডাকবাক্স না থাকায় সে চিঠিটা ফেলি ফেলি করে
আর কোনদিন-ই ফেলা হয় না।
শুধু ঘর বেড়ে যায় ভিতরে বাইরে॥

বনপথে মন্দিরের পথে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই

তিব্বতী ঢোলের শব্দে
গোল সূর্য ভেঙে পড়ে মন্দির চূড়ায়
ঝির্‌ঝির্ ঝির্‌ঝির্
বরফের সাদা টুকরোগুলো
অশ্বত্থের নীলাভ পাতায়
দ্রুত আরো দ্রুত বাজে তীব্র করতাল
বুদ্ধ মন্দিরের গায়ে
জেগে ওঠে সাতশ কিন্নর

কিছু নেই কেউ নেই
তবু
শব্দের ভেতর থেকে গান
তবু
ধ্বনির ভেতর থেকে গান
তবু
তৃষ্ণার ভেতর থেকে গান
কেন
গভীর আগুন নিয়ে জ্বলে ওঠে
কেন

পুড়ে যায় ঘর
জ্বলে যায় বন
স্বপ্নের ভেতর
জলের নিঃস্বন
জ্বলে যায় ঘর
পুড়ে যায় বন

এবং সকালবেলা যায়
এবং বিকেলবেলা যায়
এবং নীরব রাতগুলি
যায় যায় যায়
কিছু নেই কেউ নেই/কেউ নেই কিছু নেই

*

দ্রিমিদ্রিমি দ্রিমিদ্রিমি
সাঁওতালী মাদলের বোলে
গোল চাঁদ ভেঙে পড়ে বনের ওপর
ঝির্‌ঝির্ ঝির্‌ঝির্
রূপোলি বৃষ্টির ধারা পিয়ালের শাখায় পাতায়
কেউ নেই কিছু নেই

কিছু নেই কেউ নেই
তবু কেন
ধ্বনির ভেতর থেকে গান
কেন
তৃষ্ণার ভেতর থেকে গান
কেন
গানের ভেতর থেকে এক
জ্বলে ওঠে
গভীর আগুন

কিছু নেই কেউ নেই
নেই
তবু কারা
রূপোলি বৃষ্টির মধ্যে কারা
তিব্বতী ঢোলের শব্দে
মাদলের বোলে
কারা ঐ
বন পথে
মন্দিরের পথে

মুখ তোলো

কালী কৃষ্ণ গুহ

মুখ তোলো, তোমারই চতুর্দিকে
জ্যোৎস্না
স্খলিত জল, তৃণ, চতুর্দিকে
তোমারই কোমল কণ্ঠ, তোলো
ওই
নীরক্ত চোয়াল, মুছিত
প্রান্তর থেকে দূরে দেখা যায়, ছায়া
স্তব্ধতার মতো
ছায়া, দলিত স্বদেশ, তবু
জন্মান্ধ বাউল বেদনা জাগে প্রাণে, জাগে মগ্ন
অন্ধকারে মাটি, অবিবেকী কালস্রোত, দূরে
মুখ তোলো, তোমারই চতুর্দিকে
নতজানু
হাওয়া, প্রকীর্তিত বধ্যভূমি, দীর্ণ কোলাহল।

কোথায় হারিয়ে ফেলেছি

ভাস্কর চক্রবর্তী

মঞ্চের ওপর কালো কোট-প্যান্ট পড়ে যে লোকটা নেচে নেচে
একর্ডিয়ান বাজাচ্ছিল—তার কোন চোখ ছিল না।
গভীর রাত্তিরে
এইসব ভৌতিক ব্যাপার আমার ভালো না লাগাতে, আমি
চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম—অমনি
চারপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল লোকজন, আমি
চারদিকে ঘুরে তাকাতেই দেখি, প্রত্যেকেই যে-যার চেয়ারে
কালো কোট-প্যান্ট পড়ে শান্তভাবে বসে রয়েছে, এবং
কারুরই চোখ নেই। সঙ্গে সঙ্গে
আমি নিজের চোখে হাতে দিয়েই আঁতকে উঠলাম
এবং তখনই লাফিয়ে উঠে
দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়ে এলাম এক মুহূর্তে।

আমার সমস্ত শরীর তখনও শিরশির করছিল, আমি
দৌড়তে দৌড়তে
প্রকাণ্ড এক মাঠের মধ্যিখানে এসে ধপ্ করে বসে পড়লাম।
একজন লোক
বুদ্ধের মতো করুণভাবে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল
আমি ভাবলাম
এখন আমার গুণ গুণ করে গান গাওয়া উচিত
এবং আমি গুণ গুণ করে গান গাইতে শুরু করলাম, অমনি
কে ফিস ফিস করে ডেকে উঠল
নন্দকুমার নন্দকুমার।

চারপাশে গভীর অন্ধকার ও সেই সময় আমি কেঁপে উঠলাম
আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরনো স্বপ্নের ভিতর
অলৌকিক এক ফাঁসির দৃশ্য···

রামধনু-মার্কা আলোর নীচে, বিরাট ফাঁকা এক
ষ্টেডিয়ামের গ্যালারী বেয়ে
ওপরে উঠে যাচ্ছে সরু লম্বা একটা লোক।
শূন্য থেকে ঝুলছিল মোটা দড়ির ফাঁস একটা, সেই
ফাঁসের সামনে এসে লোকটা নিজেই হাত বাড়িয়ে
ফাঁসটা পরে নিল নিজের গলায় ও এক মিনিট
চুপ করে দাঁড়িয়ে
বুক পকেট থেকে বার করল শাদা একটা কাগজ এবং চেয়ে থাকল
কিছুক্ষণ—তারপর
কাগজটা মুড়ে রেখে দিল আবার বুক পকেটের মধ্যে—ঠিক তখনই
ফাঁসটা টান হয়ে বসে গেল তার গলায়
পা থেকে সরে গেল গ্যালারীর সবুজ কাঠ
মাঝ রাতে—শব্দহীন এক ষ্টেডিয়ামে
সরু লম্বা একটা লোক শূন্যে ঝুলে রইল।

এসব কথা ভাবতে আমার ভালো লাগছিল না কিছুতেই।
সামান্য জ্যোৎস্নায়
মাঠের ঘাসগুলোকে এখন অদ্ভুত রুগ্ন লাগছিল আমারও
বিদ্যুৎ চমকানোর মতো থেকে থেকে মনে পড়ছিল
আমার চোখ দুটো আমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, সেই ভয়ে
ও দুঃখে
আমার মাথা নুয়ে পড়তে চাইল ঘাসে ও মনে হল
পৃথিবীতে কোন গাছ নেই,
পৃথিবীতে কোন ছায়া নেই
যেখানে এক মিনিট চুপ করে বসে থাকা যায়।

কে যেন ঠাণ্ডা একটা লোহার চাকৃতি ধরে রয়েছে এখন
আমার বুকের মধ্যিখানে।
দশ ফুট চওড়া একটা শীত আমাকে ঘিরে ঘুরছে সমস্ত ক্ষণ।
আমার কান্না পেল ও

মনে পড়ল আমার শান্ত বিছানার কথা
মনে পড়ল মা-র কথা
মনে পড়ল মা-র পিঠের চামড়ার সঙ্গে সেলাই করা
প্রকাণ্ড ক্রুশটার কথা।

লাল ধুলো উড়ে আসছে এখন তোমাদের বাগানবাড়ি থেকে
দূর কোন সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসছে বিষণ্ণ মাল্লাদের গান
সামান্য জ্যোৎস্নায়
হাঁটুর ওপর মাথা রেখে আমি চেয়ে দেখছি, আমার
হাতের রেখা সুড়ঙ্গের দীর্ঘ-অন্ধকারের দিকে বেঁকে রয়েছে
ও বুকের মধ্যে ভাঙা-রেকর্ডে
যেন বিদ্যুৎ চমকানোর মতো ভেঙে পড়ছে আমার কান্নার স্বর :
আমার চোখ দুটো আমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি
আমার চোখ দুটো আমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

সর্বশেষ অভিমানে
মৃণাল বসু চৌধুরী

সর্বশেষ অভিমানে নিবিড় আড়ালে যাওয়া ভালো।

প্রতিদিন সকাল বিকেল নিপুণ স্থঠামভাবে
শব্দ নিয়ে সুখ নিয়ে দুঃখ নিয়ে পাহাড় সাজানো
প্রতিদিন প্রাণপণ ভালোবাসা এঁকে রাখা দেয়ালে দেয়ালে
ভয় পাছে ভুলে যাই উড়ন্ত সারস
বিশাল সমুদ্রতীর ধু ধু বালি নগ্ন অধিকার
ভুলে যাই প্রবণতা শরীরের নির্ভুল খেয়াল,
প্রাত্যহিক অভ্যাসের নামে

'ভালোবাসা ভালোবাসা' বলে
অনন্ত সময় শুধু সশঙ্কিত পায়রা ওড়ানো,

তার চেয়ে সর্বশেষ অভিমানে নিবিড় আড়ালে যাওয়া
ঢের বেশী ভালো।

এ-রকম ডুববার দাবিতে
সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন আমার দাবি মানতে হবে এই দিন চলে
আমাদের দাবি কিছু নেই
সমষ্টিকে লোভ দেখিয়ে বেতন বৃদ্ধির আশা-চকোলেট মুখে পুরে তার
মিছিলে সামিল হ'তে বলা হয় আজ
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে আনব স্বাধীনতা ভারতের এম্নি দিন সকাল এখন
গ্র্যাণ্ড হোটেলে আমাদের দাবি কেউ খেয়ে আসছে বহুদিন ধ'রে
আমাদের দাবি পণে ক'রতে বহু লোক
ভিড় করে রাস্তায় এখন
তবু তো পতাকা তুলতে যাব আমি ভিড়ের ভিতরে
সবাই কিছুতে যাতে যেতে পারে ডুবে
যেতে পারে নেশার ভিতরে
পতাকা তুলতে আমি যাব আজ এ-রকম ডুববার দাবিতে।

ঈর্ষা
ক্ষিতীশ দেব সিকদার

সম্প্রসারণের জন্য খালি জায়গা পড়ে আছে, আমাদের বিবাদ বস্তুত
মালিকানা নিয়ে, প্রতিদিন দাঙ্গার আভাস—বিবাদ জটলা
যোগ্য অযোগ্যতার বাদানুবাদ

একদিন এই খালি জমিটাই বহুলোকের বেহাত হয়ে
ভাগ্যবানের হাতে উঠবে—সেই একজন
সম্প্রসারণবাদীর প্রতি ঈর্ষা হয়,
কুমারী-জমির চৌকিদার!
ইতিমধ্যে তোমাদের সম্প্রসারণ যতদূর যেভাবে ঘটুক, আমি সর্বদাই তবে
ঈর্ষাকে অনড় শিল্পে গেঁথে রাখব, বুকের অনন্ত অধিকার!

মেঘ পটে আঁকা

বিনোদ বেরা

তোমাকে পাবার বাসনা গেছিলো বেড়ে
তাই প্রয়োজন হয়েছিলো ঘর-বাড়ি।
বহুদিন হলো তোমাকে এসেছি ছেড়ে
মেঘপটে গ্রাম যেন শ্রীরাধার শাড়ি;

বিরহের রঙ ধরেছে আকাশে ঘাসে
স্বপ্নের গাছে ফোটে অজস্র কুঁড়ি,
মধুর সমীরে দেহ পরিমল ভাসে
বাজে চেতনায় কাঁচের রঙিন চুড়ি।

মন, মিলনের উজ্জ্বল কুলহার
প্রত্যাশা ক'রে বাসনা কোরকে জাগে,
ধীরে খুলে যায় স্মৃতির জানালা দ্বার
জাগি প্রিয়তমা বেদনায়···অনুরাগে।

তোমার সোহাগ হৃদয়ে রয়েছে আঁকা
স্থির জলে প্রাণে বিদ্যুতে গড়া বাড়ি।
ফুলে ভ'রে ওঠে ফাগুনে নবীন শাখা—
দূরে মেঘ পটে আঁকা শ্রীরাধার শাড়ী

তোমাকে নিরুপমা

প্রসূন বসু

আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও নিরুপমা?
শয্যায় আমার কোন স্পৃহা নেই
কলকাতার মতো সেখানেও কোলাহল ভরা।
আমি ফিরে যেতে চাই
স্যাঁতসেতে দেওয়ালবন্দী আমার আখরায়
মৃত শরীরের মতো শীতল আস্তানা।
যদিও মাঝে মধ্যে তেলাপোকা, টিকটিকি লেংটি ইঁদুর
অথবা দেওয়ালে টাঙানো কিছু ডুবে যাওয়া মুখ
বিরক্তি সঞ্চার করে, তবুও সেখানে নিরুপমা
আমি যেন কাছাকাছি থাকি।
তোমাকেও মাঝে মাঝে পেতে ইচ্ছে হয়
কিন্তু, তোমার চোখে বড় বেশী কোলাহল।
কোলাহল ঝেড়ে ফেলে আমার শরীরে তুমি মিশে যেতে পারো।

আমাকে কোথায় তুমি নিয়ে যেতে চাও নিরুপমা?
উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে? সেখানে ত কোলাহল।
বাতাস, রোদ্দুর কিংবা পাখিদের কোলাহল।

নিরুপমা, তুমি নিঃশব্দ সময় হয়ে কাছাকাছি থাকো
আর আমাকে আমার মাঝে ডুবে যেতে দাও।

কোলাহলে আমি বড় ক্লান্ত নিরুপমা।

যা কিছু তোমার আমার

স্বপ্নেন্দু ভৌমিক

একদা ভূ-মণ্ডল ঘুরে ঘুরে অবশেষে তোমার নিকট
পার্থিব যা কিছু ছিল—দুর্জ্ঞেয়
যা কিছু তোমার আমার
পদস্খলনের বেলা

অন্য দেশে—জলাঞ্জলি দিয়েছিলে সব
কোথায় গোপনে ছিলে, দুর্নিরীক্ষ্যে
শিরে তুলে দু'বাহু তোমার
অথচ ভ্রমণে বেরিয়ে তুমি সর্বশেষ—যা কিছু রক্ষিত ছিল হাতে
পদস্খলনের বেলা—ঝিনুক কুড়াবে ব'লে
প্রতিকূলে—সফর করেছ তীর জুড়ে—
আলটপকা আসক্তি তোমার ছিল—সব পেয়ে গেলে
পদস্খলনের বেলা
পার্থিব যা কিছু ছিল তোমার আমার
একদা ভূ-মণ্ডলে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তোমার নিকট।

কাজ

শুভাশিস্ গোস্বামী

আমার এখন কোন কাজ নেই,
অবিশ্যি তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথাও নেই,
যে যার নিজের ধান্দায় ব্যস্ত আর কি,
আর নয়ত খেয়ে-দেয়ে খড়কে কাঠি মুখে দে ঘুম, দে ঘুম।
এদিকে হাড় হিম হ'য়ে যাওয়ার জো হ'ল।
মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা—
কড়াইয়ে খই ফুটছে খামোকা,
কাজ না থাকলে যা হয় আর কি!
কিছু বা কেউ নির্ঘাৎ পথ আগলে দাঁড়িয়েছে আমার।
কেন বাবু, মানে মানে সরে পড় না।
নইলে আমাকেই আবার অর্ধচন্দ্র···হেঁ হেঁ!
আর সেটাই কি খুব ভালো দেখাবে।
আর কাঁহাতকই বা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়,
কিছু একটা করা তো চাই,
পৌঁছোনো চাই তো কোথাও।

একজায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালাইচাকি খুলে যাবার জোগাড়।
ট্রেনের চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই।
'কোথায় যাবে', 'ইষ্টিশনের নাম কি গো?'
সব ইষ্টিশনই দেঁতো হাসি হাসে:
'জা···নি—না—আ—আ—আ।'
না বাপু, আমার একটা ষ্টেশন চাই;
পৌঁছাতে তো হ'বে কোথাও।
এখন আমার কোন কাজ নেই; কাজ চাই, কাজের কথা।
তিন মাথা এক হ'য়ে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে ভাল্লাগেনা আমার।
আর বাজে কথা বললে লোকে বড় সদর দরজা দেখিয়ে দেয়।
সেটাই কি খুব ভালো দেখাবে?
আর বাজে কথা মানেই তো
খানিকটা বুদ্ধির পিণ্ডি-চটকানো আর বেলেল্লাপনা।
কে কার পাকা ধানে মই দিয়েছে,
কে কার মাথায় কাঁটাল ভাঙল,
কে কার ভিটেয় ঘুঘু চরাবার ধান্দায় আছে ইত্যাদি কিস্‌না।
তাই আমার কাজ চাই, কাজের কথা।
কারখানা খোলা থাকলে কাজও হয়, ওভারটাইমও।

সব জেনে তবু

নচিকেতা ভরদ্বাজ

সব জেনে তবু আমি তোমার শরীরে, অন্ধকারে
স্পষ্ট হতে চাই: এই—জীবনের মানে
ধ্রুপদ গানের মত মুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিপ্লাবী
হয়ে যেতে চায় ঐ শরীরী সপ্ত-সিন্ধু পারে।
তা না হলে পরিচিত পথ ধরে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে
—এই রূঢ় অভিজ্ঞানে

কী পেয়েছি?—আমাকে কী দিয়েছে পৃথিবী
কৃপণ সঞ্চয় থেকে তার?
তোমার আকাশ নদী তবু আহা সম্মোহিত হলে
এ আঁধারে, যন্ত্রণায় সৃষ্টির উচ্চার
সম্ভব হতে পারে। অথবা কী হবে সৃষ্টি দিয়ে?
তোমার সত্তার আলো বুকে করে ঘুমিয়ে থাকার
এই সাধ স্বপ্ন হয়ে দিকে দিকে মরে
ভোরের শিশির হয়ে; দর্পিত কুয়াশা নিভিয়ে
ছাখো কী যে সূর্য করোজ্জ্বল এ চেতনা!
তোমাকেই মনে পড়ে প্রহরে প্রহরে:

তোমার তনুর তৃষা শ্বেত-পুষ্পে চন্দনে সোনায়
দুর্বা ধান্যে আলিম্পনে যেন এক অর্ঘ্য রচনা—
কোনো দূর দেবতার দিকে সমর্পিত।
আমাকে এ বিলুপ্তি থেকে—প্রসন্ন দীপ্ত দেবতায়
পরিণত করতে পার—। তারপর দিতে পার সমস্ত দর্পিত
অহংকার—স্নিগ্ধ শিখা আলোর অঞ্জলি।

বলো মেয়ে, আমি কী সে দীপ্ত অর্ঘ্য জীবনে পাব না?
অচেনার অন্ধকারে চিরকাল থেকে যেতে হবে?
তোমার পবিত্র চূড়া বুকভরা ঝলসিত সোনা
অনাবিষ্কৃতই থাকবে? সময়ের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে দুয়ারে।
তুমি কি দেবে না ডাক আষাঢ়ের আশ্চর্য উৎসবে?

কলকাতা, পুতুল রাণী আমার
বেলাল চৌধুরী

পুতুল রাণী জানতে বিষম ইচ্ছে আমার
চার লক্ষ ভুয়া রেশন কার্ড ধরা পড়ার পরে
বেঁচে আছো কেমন করে অদ্যাবধি

আমার খবর সেই একই রকম চালচুলোহীন
কাটছে দিন বিত্তবিহীন নিরবধি
মন্দা বাজার দিনকাল যা হয়েছে
ভাবলেই কেমন মাথা ঘোরে

মধ্যরাতে এখনো কি নিরন্তর
ইন্দ্রপতন বিস্ফোরণ তোমার ঘরে
মাতাল বেহেড শিল্পী কবি চোর জুয়াড়ি
রূপের হাটে জমায় ভিড়

চোখের কোলে ঘন কালির রেখায়
আর কতকাল ছুঁড়বে মোহের নয়ন বাণ
মায়া অঞ্জনের নেশায়
ভোলাবে পথ হাঁটুরে পথিকের

ভীরু প্রদীপ শিখার মতো
বিজলি বাতির তীব্র জটায়
নগ্নদেহে নিরাভরণ দুই উরুর মাঝে বিস্তৃতি এক জীবনের অন্ধকার
রন্ধ্রপথে নিয়ে যেতে পার কতদূর
বিস্তারিত জানিয়ে লিখিও আমায় দোহাই তোমার

তোমাকে এবং নিজেকে
পার্থ রাহা

মৃত্যুংজ্ঞাত্বা মৃত্যুস্তরন্তীতি নচিকেতার কাছে
অযুত আয়ুর উত্তরাধিকারে
পরাজিত অহংকারী আমি
পাঠে রত

নানাবিধ ব্যক্তিগত উপকার হতে পারে ভেবে
বহুদিন তোমায় দেখিনি—তাই আজ
আমারই রক্তে স্ফীত থ্যাতলানো মশাকে যখন
আমাকেই অবিরত সৎকার করে যেতে হয়
তেমনই-এক অনিবার্যতায় পাঁচটা পঁচিশে
অপেক্ষা করে ভেবেছি গাড়ী বারান্দার নীচে
নানাবিধ ব্যক্তিগত উপকার হতে পারে ভেবে।

কিছুকাল সাধনায় আধিভৌতিক দূরদৃষ্টি পেয়েছি এবার
কুরুণ্ডক-মহালেনে গুহ্যশীর্ষে সাংকেতিক তথ্যপূর্ণ
বহু বহু মীমাংসা পাঠাবো ;—অর্থাৎ
আমার রক্তের স্রোতে সুতানুটি গোবিন্দপুরের মসলিন জাহাজ
তিনশো-বছর ধরে ক্রমাগত জলক্রীড়া করে অবশেষে
মাথা কুটবে চৌরঙ্গীর ভীড়ে
দুর্ঘটনাসংকুল কোন চৌরাস্তার মোড়ে
তোমার বুকের ঠিক মধ্যিখানে
অন্ধকার খালে খুঁজি
ভালবাসা।
ভালবাসা এখন আমার খুব কাছে।
দুর্ঘটনা এখন আমার খুব কাছে।

রবিবারময় দিনগুলি তোমার হারমনিয়ম সহযোগে
একটানা রবীন্দ্রসঙ্গীত
অথবা আউটরামঘাটে জাহাজের বাঁশি শুনে ঘামে গড়াগড়ি
তোমার সঙ্গীতে কিম্বা আমার রক্তের মধ্যে
বাঁশি বাজে—
অর্ফিউসের বাঁশি।
অর্ফিউস ··অর্ফিউস···মানুষের প্রিয়তম অর্ফিউস ··
কোন এক বসন্তের দিনে
রেজিস্ট্রী অফিসের পথে যেতে যেতে

তোমাকে নরকে নেবো চকমিলান সিংদরোজার সটান সামনে।
তুমি ভয়ংকর চতুর্মুখ কুকুরের নির্বিকার প্রশ্নের উত্তর
দিতে দিতে
অবসন্ন হবে।
আমিও মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ভালবাসা বিছিয়ে রাখবো।
সমস্ত পোষাক খুলে স্বর্গ ও পাতালের মুখ দেখবো প্রচণ্ড কৌতুকে
রক্তের ভিতরে এক রক্তহীনতা নিয়ে
সময়ের ভিতরে এক সময়হীনতা নিয়ে
ভালবাসা এবং তোমাকে শেষবার বিদায় জানাবো।

অতঃপর নচিকেতা আমাকে পঁচিশ শিয়ের পাঠ এনে দেবে।

নখদর্পণে

শুভঙ্কর ঘোষ

নখ দর্পণে যা ছিল জানার, তা পাবার নয়, নয় প্রত্যাশিত
করতলে অখণ্ড মনোযোগ দিলে আমার সমস্ত সত্তা
থরোথরো পেণ্ডুলাম দোলে

অতো রাগ কেন, সখা
কেন অভিমান।
পুনরায় ব'লে দিতে হবে না তোমায়, বুকের ভুবন জুড়ে
সমুদ্রে আছে, অত সান্ত্বনা

আপাতত, অন্ধকার মাখি স্নেহ বীথিকায়
অন্ধকার নেচে ওঠে
হৃদয়ে হৃদয়ে

কিছুক্ষণ হাত জোড় করে বসে থাকা যাক।

তারপর···
তারপর·····
তারপর আগুন জ্বালাব গোপনীয়তার অধিকারে

অন্তত কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকা অনন্ত ব্যথায়
ব্যথা বুক জুড়ে
আমি জানি, করতলে অখণ্ড মনোযোগ দিলে
আমার সমস্ত সত্তা
থরোথরো পেণ্ডুলাম দোলে।

মাদী শুয়োরটাকে দেখুন
অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমার যখন ন বছর বয়েস
একটি প্রৌঢ় আমায় তাঁর বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়ে
একবারও ময়লার মতো আমার হাপপ্যাণ্ট খুলে নিয়েছিলেন।

সারারাত আমি ককিয়ে ককিয়ে উঠেছি—
তাঁর এবরো-খেবরো শরীরের নীচে কি শূল লুকোনো ছিল?

আজ
চারপাশে হেমন্তের হলুদ রুমালের ভীড়ে
সেই হাজা-ওঠা পোড়-খাওয়া টোল-খাওয়া প্রৌঢ়ের
লিঙ্গের মতো করুণ মুখ
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে হিলি সাপের মতো
লকলকিয়ে ওঠা ত্রিশূল ত্রিশূল···

আমি কি শুধু বিদ্ধ হতে জানি,
জানি
সাঁওতাল গ্যাঙের হাতে মাদী শুয়োরের মতো ছটফট করতে, চেঁচাতে?

দিলীপ ঘোষাল
রবীন সুর

দু' মাস বিশ্রাম নাও, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর নির্দেশ;
রাত্তিরে আটঘণ্টা ঘুম, নিয়মিত স্নানাহার ইতি অনুপানে
পরমায়ু দীর্ঘ হবে কিন্তু তাঁরা জানে না বুদ্ধের
শিশুর বিশ্রাম সাজে, শোভা পায় রোগীর শিয়রে পথ্য সময় নিয়ম
এবং মূর্খেরা শুধু দীর্ঘতর জীবন প্রয়াসী;
বরং এস হে বাপু এখন খোঁয়াড়ি ভাঙি দুপুরের বাদামী রোদ্দুরে
সোনালী ঈগলমার্কা দু' গেলাসে ভেজাই সন্তাপ।

সংসার সংসার সুখ, বড়বাবু প্রমোশন, বকেয়া বেতন
উদ্ভিন্ন প্রেমের নিষ্ঠা. ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা-আক্ষেপ
ও সব বালাই নেই, একবার আকস্মিক দুর্লভ জীবন,
ঐশ্বরিক নীতি-নেতি আপেক্ষিক সত্যাসত্য বাদ-বিসম্বাদ
মগজে আসে না ভাই তবে জানি ধ্রুব শনিবারে
ঘোড়ার ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'লে নির্বোধের বিধাতা বেকুব,
হৃদয় গড়ের মাঠ, দিবারৌদ্রে আহাম্মক গাড়লের দু'চোখে খোয়াব।

বাস্টার্ড টাস্টার্ড বললে সহ্য হয়, মাতালের অপবাদ বুঝেছো রবীন
কেমন দুঃসহ লাগে। আমার জন্মের গল্প অফিসের মধ্যাহ্ন টিফিনে
পাড়াপড়শি আত্মীয়ের তুলনামূলক সূত্রে ব্যক্তিগত শ্লাঘা উদ্দীপক,
তিরিশ বছর আগে জানি না কোথায় কোন রমণীয় কাম
কার দেহে লগ্ন ছিল বাধাহীন আসঙ্গ আশ্লেষে
শুধু এইটুকু জানি আমি আছি আছে আছে জঙ্গম পৃথিবী
গোলাপ ফুলের রক্ত রমণী রাত্রির নেশা দুরন্ত যৌবন।
বুকের ভিতরে তাজা অলিম্পিয়া অম্লান গোধূলি।

এই সব বলতে বলতে গড়পাড়ের দিলীপ ঘোষাল
রামগন্ধী পেয়ালায় ডুবে গেল এপ্রিলের মাতাল সন্ধ্যায়।

জ্যোৎস্না হলেই

সত্য গুহ

জ্যোৎস্না হলেই একটা সকালের প্রতিকৃতি যেন
রাত-বিরতির কাক ভ্রমে পড়ে, খুব ডাকে, ইচ্ছে করে দিশাহারা হয়।
আমরা যারা এখনো রাত চিনতে ভুল করিনি,
অন্তত ছ' ঘণ্টা ঘুমুতে অভ্যস্ত,
তাদের ঘড়ির দম ফুরায় না।

আমরা লম্বা লম্বা স্বপ্ন দেখি, কেননা
সব রকম ব্যথায় আমাদের লাখ লাখ পেনিসিলিন ছাড়া কথা নেই
কেননা, স্বপ্ন দেখি বলেই ঘুমোলে মরার মতো থাকি
আর যতক্ষণ না কিডনির দাপট মেধা পর্যন্ত পৌঁছোয়
অলীক বস্ত্র হরণ পালার নায়ক
কিম্বা সীতার পাতাল প্রবেশের উত্তরাঙ্কের পরশুরহিম
আমরা ধানক্ষেত দীঘিকাটা করি ;
নেপথ্যে সেই আদিম আবহ সঙ্গত। চিরকাল
জ্যোৎস্না হলেই একটা সকালের ভাব
কাকেদের ভাবিয়ে তোলে
আর গাভীগুলো জাবর কাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়,
ঠাকুরদা মশাই কেমন অসহায়ের মতো গেয়ে ওঠেন গোষ্ঠ।
আর আমরা যারা এখনো রাত চিনতে ভুল করিনি,
অন্তত ছ' ঘণ্টা ঘুমুতে অভ্যস্ত,
তাদের ঘড়ির দম ফুরায় না।
লম্বা লম্বা স্বপ্ন দেখি, কেননা,
দিনকে রাত করবার ক্ষমতা একমাত্র আমাদেরই।

মানুষকেই ঈশ্বর তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব করে গড়েছেন।
কেননা, জীবনে ভালো না লাগলে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।
আমি কখনও ঈশ্বর বা মৃত্যুর কথা ভাবি না
আমি সমস্তক্ষণ মেয়েছেলের কথা ভাবি

আমি সমস্তক্ষণ শিশুদের কথা ভাবি
আমি সমস্তক্ষণ আমার ও আমার বন্ধুদের কথা ভাবি
একটা বাদুড় ইলেকট্রিক তারে পড়ে অনেকক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করলো
অথচ ঈশ্বর ওকে রক্ষা করলেন না।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেছিলেন 'আপনার বিয়ে করতে কত টাকা চাই, সত্যবাবু?'
আমার বিছানায় এখন জ্যোৎস্না অথবা নারী

হে মধুর, হে চাঁদ, হে নীল হিম ধাতুর আকাশ
আমি শুধু পেচ্ছাপ করতে উঠেছি।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

হৃদয় যত গভীরে যাবে তত কি হবে একা,
এ কেমন রূপখনি—
দু'খানি চোখ ঝল্‌সে গেল, ঝল্‌সে গেল মুখ,
এখন মন আহত ব'লে নিয়ত উৎসুক :
কখন হবে কোথায় হবে কিভাবে হবে দেখা।

আকাশ পাতাল খুঁড়ছে প্রিয় জলের কলরব,
কি প্রবল স্রোতোরাশি—
মাথার মধ্যে আছড়ে পড়ে, তৃষিত করে দেহ,
শ্মশানময় ছড়িয়ে থাকে গভীর সন্দেহ :
এবং ছোঁয় ঘৃণিতঘন শিশুর অনুভব।

শরীরে ; ও কি হেঁটেছে যত কেঁদেছে বেশী তত,
কেন ভেঙেছে প্রিয় বাড়ি—
চিবুক জুড়ে গভীর ক্ষত, গভীর ক্ষত চোখে,
ও নিজ-হাতে রেশমী সুতোয় জড়াল নিজলোকে :
মহান কোন আয়ুর মত ক্ষয়েছে মহাব্রত!

হৃদয় যত গভীরে যাবে তত কি হবে একা,
এ কেমন রূপখনি—
জীবন বুঝি ঝল্‌সে গেল, ঝলসে গেল দেহ,
শ্মশানময় ছড়িয়ে থাকে গভীর সন্দেহ :
কখন হবে কোথায় হবে কিভাবে হবে দেখা।

পুতুল-খেলা
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সারাটা দিন পুতুল খেলা। রাজার বাড়ী
ইস্টিশনের কিনার ছুঁয়ে
বিচার সভার কী আয়োজন!
ট্রেন থেকে কেউ নেমে এলেই
কারো ফাঁসি,
কারো বা হয় পুনর্বাসন।

এই প্রদেশে সারাদিনই ঘণ্টা বাজে—
বিপজ্জনক সময়গুলি
রেলের চাকার শব্দ হলে নাচতে থাকে।
টিকিট কেনার ধুম পড়ে যায়। সারা স্টেশন
নির্বাসিত হাওয়ার ওপর ভাসতে থাকে।

সারাটা দিন পুতুল খেলা। সারাদিনই
সিংহাসনে রাজামশাই—
কেবল বসে বিচার করেন। তোরণদ্বারে সিপাহীরা
দেশবিদেশের টিকিট বেচে। কেননা, এই পুতুল বাড়ী
ইস্টিশনের ঈশান কোণে—
সারা প্রহর গাড়ী ছাড়ার নিঝুমতর ঘণ্টা শোনে।

আপোষ! আপোষ!
তুলসী মুখোপাধ্যায়

আসলে তরোয়াল ঘুরোনো তোমার নেশা বৈ তো নয়
তাই মাঝে মধ্যে শানঅলা ডেকে কড়া মাজা দাবী করে বসো।
অতঃপর আয়নার সামনে শরীর বাজিয়ে বলো
শেরপুরে যাবো—আমি শেরপুরে যাবো
সৌখিনতা ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায় আর!
তবুও তরোয়ালে বন্‌বন্ করা তোমার নেশা বৈ তো নয়।

তোমাকে তো যাদুমণি হাড়ে হাড়ে চিনি
চাঁদে পুরো মজে আছ—তাই
দেয়াল সাজাবে বলে অফিসের ট্রাম চুরি করো
চাঁদে পুরো জমে আছ—তাই
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুদে অভিলাষ খুব
তোমাকে তো চিনি চাঁদু—
এইসব ছেড়েছুঁড়ে তরোয়ালে পোষা হয়ে যাবে
এইসব পরিপাটি ছত্রাকার করে শেরপুরে ছুম হারাবে।
অতএব আপোষ! আপোষ।
পাপোষের নীচেও তুমি সুবিপুল আপোষ রেখেছ।

তথাপি একেকদিন আরশুলা হেঁটে গেল ঘুমের ভেতরে
পিঁপড়ার সারির মতো ভেড়া আসে গুনিনের উপদেশ মতো
অকস্মাৎ কী যে হয়ে যায়—
নিজেরে হুবহু তুমি দেখে ফেল ভেড়ার কাতারে
কী যে হয়ে যায়—
বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়ে দিয়ে নিজস্ব টঁ্যাকশালে ধরা পড় তুমি
একেকদিন মাঝরাতে ঘুম ছিঁড়ে উড়ে গেলে ঘূর্ণি বাতাসে
চেয়ে থাকো—
পেঁচার ডাকের মতো চারিভিতে ক্ষুরে খাওয়া ক্ষয়
চাঁদে ক্ষয়, প্রভিডেন্ট সুদে ক্ষয়
চিত্রিত দেয়াল জুড়ে উইএর এঁটোর মতো ক্ষয়।

তক্ষুনি খাপ্ থেকে তরোয়াল হাতে চলে আসে
কড়া মাঞ্জা দাবী করো শানঅলা ডেকে
অতঃপর আয়নার কাছে চৈতন্য বাজিয়ে বলো
শেরপুরে যাবো—আমি শেরপুরে যাবো···
ব্যস! নেশা শেষ! দেনা শেষ! পরোয়ানা শেষ!
চাঁদে পুরো মজে আছ—তাই
আপোষের সঙ্গেও তুমি সুনিপুণ আপোষ করেছ।

আসলে তরোয়াল ঘুরোনো তোমার নেশা বৈ তো নয়।

দৃষ্টি
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

একবার চৌমাথায় দেখেছিলে তাকে।
সে-ও-একবার বুঝি, দেখেছিল, বুঝি একবার।
আরবার ফিরে আর দেখ নি তাহাকে,
কুড়ি ঘণ্টা পরে শুধু ছাপা-ছবি দেখেছিলে তার—

দৈনিক সংবাদপত্রে পাইকা-বোল্ড খবরে প্রকাশ,
"মেটিয়াবুরুজে এক অন্ধ বাঁক গলির ভিতরে
মনিময় নামে এক যুবকের রক্তে-ভেজা লাশ
পাওয়া গেছে শেষরাতে। হত্যাকারী এখনো নিখোঁজ।
তদন্ত চলেছে জোর, যদিও ঘাতক, সাক্ষ্য কোনো রাখে নিক' ঘরে।'
এরপর আন্দাজে সব নানা কথা ছাপা আছে হাবোজ-গাবোজ।

একবার শুধু দেখেছিলে তাকে, একবার।
সে-ও একবার, ক্ষণকাল, দেখেছিল বুঝি
ফিরে আর দেখাদেখি হয় নি আবার,

অতঃপর দু'জনে যে যার ট্রাফিকে রাস্তায় ট্রামে-বাসে
একচুল সময় না-ফেলে, চলে গিয়েছিল সোজাসুজি।

মধ্যখানে মুহূর্তের হন্তারক দৃষ্টির চিৎকার—
হাওয়ায় খুনের সাক্ষ্য রেখে উড়ে গেছে শেষবার,
চৌমাথার উপরে, আকাশে।

অনেক অমল ছিল
নিখিল কুমার নন্দী

সংলগ্ন সপিত শূন্য আশ্বিনেও: আকাশের সমকোণে তটময় হায়রে ধিক্-কার
কোনো শাদা লঘু পাখা কোনো নীলকণ্ঠ ফুল স্তবকে জড়ানো সোনাসুতোর বাহার
কেউ না কিছু না, ভীরু নিল
কণ্ঠ ভ'রে বিষ আর মালা ভ'রে উৎকণ্ঠা কণ্টক
কে যে নীলকণ্ঠ ফুল পাখি কে যে শেফালির সাদা-হলুদাভ মেঘে পংক্তিচর বক
সমস্তই ছিঁড়ে উড়ে গেছে অমাশূন্যে দীর্ণ নিঃস্বতা বাজাতে
বিকট ও রুক্ষ বক্ষে লেলিহান অন্ধ রক্ত কক্ষে কক্ষে অন্ধকার দুঃখকে সাজাতে
অপরূপ: অনুরূপ এ-শরতে সেদিনও তো দিগন্তে হে বন্ধুগণ
অনেক অমল পুণ্য ছিল।

পট ১
ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ আকাশে যেন ভাঙলো কে কবাট
সবুজ সমুদ্রে নাচে মেঘ ভাঙা আলো
অবসন্ন আষাঢ়ের বিবর্ণ বৈকালে
প্রযোজিত এক দৃশ্য দারুণ জমকালো॥

মনে হল স্নেহবৃদ্ধ সুস্মিত সবিতা
অবলোকন করেন প্রসন্ন হিরণে

ধাত্রীমাতা আষাঢ়ের রুদ্ধ অন্তঃপুরে
নবোদ্গত শস্যদলে চকিত ঈক্ষণে॥

আলোর বিস্ময় ছুঁয়ে নব কিসলয়
ঊর্ধ্বে তুলে মুখ বন্দে প্রসন্ন পিতার
দীর্ঘসূত্রী দিনমান ক্রমশ সংক্ষেপ
সূর্য যেন স্বপ্ন হয় আষাঢ় সন্ধ্যায়॥

খুন করে গেছে

অমিতাভ দাস

সময় আমাকে বড়ো নিদারুণ খুন করে গেছে।

আমার সাম্রাজ্য ছিলো, সাজানো দেয়াল শোভিত চিত্রমালা।
ঈশ্বরবিহীন এক নিয়তির প্রশ্নমালা আমাকে উত্তর দিতে
সকাল সকাল উত্তর দিকে নিয়ে গেলো।

সময় আসনে বসে নিদারুণ খুন করে গেছে।

আমার চারিপাশে বাগানের মতো দুর্লভ দুরুহতা,
শীতল নিহিত পৃথিবীতে শূন্যতার ডালপালা ধরে
চুম্বন বিস্মিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে পৌরুষ শানিয়ে
নির্ভর প্রতিমা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার আমি
শান্তি ছায়া উচ্ছল সরোবরে স্নান করবো, বাগানের অঝোর ধারা;
শোক মুছে হৃদয়ের উন্মোচনে-জাগরণে—সবুজ রক্তিম রশ্মি
নিষ্কাম নীলিমা। এই নিয়ে চোট খাওয়া অন্ধকার থেকে
বাগানকে তুলে ধরবো।
সব দুঃখ ধুয়ে নেবো পরিশ্রুত জলে।

সময় আমাকে বড়ো সুগোপনে নিদারুণ খুন করে গেছে।

দুই হাত জড়িয়ে মৃত্যু

সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দুই হাত—দুই হাতে জড়িয়ে ধরার মত অকলঙ্ক
দুই হাত ফুলের মতন শুভ্র বসন্তের সজীব সবুজ
দুই হাত ছিল না কী তোমার দু' চোখে ধরা
দুই হাতে জড়িয়ে ধরার মত ঘন মেঘ
তোমার খোঁপায় ফুল তারার মতন।

দু' হাতে খোঁপার ফুল, আহা, ঘন মেঘ জড়িয়ে জড়িয়ে
দুই হাতে নিস্তরঙ্গ মাকড়সা তুমি জাল বুনে চলো
দুই হাতে দোলনার জালে প্রজাপতি দোল খায়
দুই হাত বাঁধা আমি ধরা পড়ি সেই তন্তুজালে

প্রজাপতি—আহা তার মত মৃত্যু নিয়ে ভুলে যাই ভুলে যাই
দুই হাতে দোল দাও তুমি মৃত্যু অকলঙ্ক ফুলের মতন।

অধিকন্তু ২২

বিনয় মজুমদার

ক

মর্ত্যলোকে বাসকালে এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছি—
অধিকাংশ কার্য আমি কী এক অদ্ভুতরূপে সম্পাদন করি
প্রায়াবচেতনা দিয়ে হয়তো বা যাতে এই ঐশ্বরিক কার্যাবলী প্রায়
করি ব'লে বুঝিই না, করার সময়ে প্রায় বুঝি না যে করি।
অথচ সজ্ঞান কার্য এবং অজ্ঞান কার্য এ দুয়ের যোগাযোগ বোঝা
মোটেই দুরূহ নয়—সহজেই লক্ষ্য করা যায়
এ সকল কার্য আমি নিজেই করেছি, করি কী এক অদ্ভুতরূপ যেন
যেন অতি চেতনার অস্তিত্বের ফলে।

খ

যে কোনো অনবহিত বিষয় জানতে হলে, বিষয়ে ভাবতে হলে, দেখি,
অতি স্বতস্ফূর্ত ভাবে যা আমার মনে হয়—সে বিষয়ে মনে হয় তাই
প্রায়শ নির্ভুল ব'লে প্রতিপন্ন হয় ;
অথচ সর্বদা সবই নির্ভুল হওয়ার কথা, সখি।

গ

এমতাবস্থায় আমি ঈশ্বরীকে প্রশ্ন করি জ্ঞাতব্য বিষয়ে
আলোকপাতের জন্য, ভ্রান্তিহীনতমরূপে জানবার জন্য প্রশ্ন করি
এবং প্রত্যেকবার অন্তরবাসিনী দেবী কেশে ওঠে, সাড়া দিয়ে ওঠে
অর্থাৎ নিজেই আমি কেশে উঠি, প্রশ্নের উত্তর সত্য হলে
একবার কেশে উঠি, ভুল হলে দুইবার—এই পদ্ধতিতে
যে সব সংবাদ পাই সেইগুলি সর্বদাই যথাযথতম।
কায়াহীন হয়ে তবে অনুরূপ অস্তিত্বের প্রণয়ের আশ্বাস রয়েছে—
অনুরূপ ব্যবস্থার স্বস্তিময় আনন্দ রয়েছে।

আগন্তুক মুখ

সন্তোষকুমার অধিকারী

যেন চারিদিক থেকে ছুটে আসে, ক্রমাগত : আসে।
অজস্র ঢেউয়ের মত
অবারিত ;
ট্রামে বাসে ফুটপাথে ঘরের অলিন্দে
দুর্বার স্রোতের মুখে উপছে আসে অজস্র উদ্ভিদ্।

আমি ত' চিনিনা কারুকেই
কে বন্ধু, সুহৃদ? চেনা কোনকালে ছিলনা কখনও।
কে আমার পরম আত্মীয়? নাম···
কোন্ নামে পরিচয়? প্রবাহিত বিপুলা স্রোতের
হৃদয়ে কে কবে জানে?

অফুরন্ত দিবালোকে খণ্ড খণ্ড চেতনায় জেনে
কোন্ চিহ্নে নিরূপণ?

একদৃশ্যে প্রতিদিন, তবু তারা এক নয় জানি,
একই কণ্ঠ, তবু এক নয় সে মানুষ।
মুহূর্তে মুহূর্তে তার প্রধাবিত শিরার শোণিতে
ছুটে আসে নিরন্তজলের ধারা
উচ্চকিত কীর্ণ অন্ধকারে।
সে থাকে প্রত্যুষ থেকে মধ্যাহ্নের চলিষ্ণু আলোকে
বিবর্তিত হ'য়ে বারে বারে,
অন্য এক আগন্তু মুখ॥

অন্বেষণ

মুক্তি দাশগুপ্ত

ভূমিষ্ঠ হলেই শিশু কাঁদে, গর্ভধারিনীও
মেয়ে হলে সারা পরিবার
একান্ন ভোজনে তুমি কি জন্যে আষাঢ়?

প্রণম্য হলেই শিষ্য আসে দক্ষিণাও কিছু
শিষ্যা হলে উচ্ছিষ্ট যৌবন
ব্যর্থ গর্জনে তুমি না এলেও চলবে শ্রাবণ।

আষাঢ়স্য অন্তিম দিবসে শ্রাবণস্য-রাত
শরীরের জাহাজে ঘুমায়
নৌকাডুবি হয়ে গেলে পাটাতনে হেসেছি হত্যায়।

অন্বিষ্ট আষাঢ় খোঁজে, বঙ্গোপসাগরও
খুব ভালো তিনভাগ স্থল।
আষাঢ় সদর নয়, শ্রাবণ তো ডাহা মফঃস্বল।
মুহ্যমান হিমালয় ফেরি করে খণ্ডিত তুষার
মহীসোপানের পাড়ে ফিরে যাও প্রৌঢ় আষাঢ়।

নিরুত্তর

ফিরোজ চৌধুরী

দেহের অ্যানাট মিটা
মোটামুটি জানা আছে আমার :

কিন্তু মাঝে মাঝে
বড্ড ইচ্ছে করে
তোমার হৃদয়টাকে একবার
চিরে চিরে দেখি।

দীর্ঘকালের সঞ্চিত সম্পদ
হয়তো লুকানো রয়েছে থরেথরে।

সেকি শুধুই আকরিক লৌহ, কয়লা
অথবা নিবিড় বনস্পতির ছায়া?
সে কি প্রেম স্মৃতি
না শুধুই আত্মদহনের আবর্জনা?

এ জন্মে শুধু প্রশ্নই রয়ে গেল—উত্তরবিহীন।

সহজাত কবচকুণ্ডল?

অমলকান্তি ভট্টাচার্য

তুমি কি মরো নি ডাকিনীর বুকে কৈশোরে কোনোদিন?
ওষ্ঠে, যেখানে শৈশব গেলে ধু ধু করে মরুতল,
কল্পস্তন কখনো হয়নি দৈবদুগ্ধহীন?
দেবপুত্রের মতো সহজাত পেয়েছিলে কুণ্ডল?

মধ্যপথের নিরেট গুমোটে কতো মোহ তঞ্চক…
চকিত বাতাসে মহারথী ভাবে, জীবনই তো অভিরাম!
ভবনে তোমার তবুনো, যখন কেঁপে ওঠে ভূস্বক,
জানালা রুদ্ধ,
দৃঢ়নিবদ্ধ
স্বয়ংসিদ্ধ কাম।

নিষ্ফল দিনে মূঢ় অভিমানে পৃথিবী শত্রু ভাবি;
অথচ অনেক হীন অধরের লালায়িত হুল্লোড়ে
নাজেহাল বাঁটে—তবু—তুমি ছিলে টইটম্বুর গাভী:
ওরা চেটে নিলো যেটুকু পড়েছে পথে-ঘাটে ঝ'রে ঝ'রে।

এদিকে, অনেক আয়াসে ঠেকিয়ে অমোঘ শিলাচ্যুতি,
মিনাররক্ষী সান্ত্রীরা আজো প্রতিরোধে উন্মাদ…
ভবনে তোমার কেমন সহজ প্রবেশের প্রস্তুতি—
দোরে কড়া-নাড়া…
অন্দরে সাড়া…
এবং স্বাগতবাদ।

এই বসন্তে বৃষ্টি হবে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এম্‌নি ভাবো
শিখর থেকে নখ অবধি পারলে এক লহমায় খাবো
যেমন খেতো বক-রাক্ষস, সাল-পুরোনো ম্যাজিকঅলা
আমার বুকের ওপর ভিজ্‌ছে, তাই ভেজে নি বুকের তলা
কী যে তোমায় বৃষ্টিবাদল—আকাশ দেখছি হরিদ্রাভ
আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এম্‌নি ভাবো।

দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট, সব ঘাটে কি থামছে তরী
ওপর-নিচ্ পারদের ফোঁটা, এই তো সময়, গলার দড়ি
বসছে আলিঙ্গনের মধ্যে যেমন বসে অধর-ওষ্ঠ
দূরদেশী ও রাখাল ছেলে, কই ধেনু-উচ্ছ্বল গোষ্ঠ
কই মেলা, সাপ-খেলানোর বাঁশি, বাউল ক্ষেপা বাসরঘরী—
দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট, সব ঘাটে কি থামছে তরী?

ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে—এই বসন্তে বৃষ্টি হবে
আকাশ মেঘে করবে তাথৈ, মন বসে সাঁওতাল-পরবে
লক্ষ্মীটি ওই ঘাগ্‌রাবরণ পরজাপতি পুচ্ছ তুলে
আয় বিদেশে বাস্ত করি চাল-চুলো-চৌকাঠটা খুলে,
নীল দিগন্তে ফুলের আগুন—সেই আগুন-পোড়াচ্ছো কবে?
ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে, এই বসন্তে বৃষ্টি হবে।

নিভৃত শঙ্খ
সুনীল রঞ্জন রায়

পবন বহিয়া যায়
ভাটিয়াল তাপ দাহ আনে দূরের প্রাশান্তে
দ্বীপ নিভে যায়, দ্বীপ গড়ে ওঠে;
মগ্ন হাওয়ায় কারা যেন গেয়ে যায় গান
অবেলায় আমার একবারে ছিল না জানা॥
দূরের সমুদ্রে মত্ত হাঙরগুলি মস্তক তোলে দশদিকে।
আমাকে কোরো না গ্রাস
আমি নিভৃতের শঙ্খ।
মাঝে মাঝে ডুবে থাকি;
অথচ ডুবুরির গৃহ আমার যে জানা নেই।

পবন বহিয়া যায়
ভাটিয়াল তাপ দাহ আনে দূরের প্রশান্তে;
দ্বীপ নিভে যায়, দ্বীপ গড়ে ওঠে,
মগ্ন হাওয়ায়—কারা যেন গেয়ে যায় গান
আমাকে করো না গ্রাস—
আমি নিভৃতের শঙ্খ,
মাঝে মাঝে ডুবে থাকি
সাগরের কোণে।

ওজন
নিমাই চট্টোপাধ্যায়

প্রায় তিন মণ ওজন নিয়ে
বুড়ি মারা গেলেন।
জীবৎকালে তিনি
আরো একটু বেশি ওজনে
চলাফেরা করতেন!
এখন কয়েকজন
কাঁধবদল করে
তাঁকে নিয়ে এলো
কাছের শ্মশানে।
মুখাগ্নির পর
নাতি তাঁর
এক-কোণে বসে রইলো
চুপ করে।
অন্যেরা বলাবলি করলো:
'বুড়ি খুব সহজেই পুড়বে—
'অনেক পুণ্যে মরেছে, চর্বিও অনেক।'
একটা দাহতে বরাদ্দ কাঠ আট মণ
ঠিকাদার যোগান দেয় মেরেকেটে সাত মণ।

একই সঙ্গে
মোটামোটা গুঁড়ি কাঠগুলো,
আর
বুড়ির মেদ মজ্জা অস্থি
সবই ছাই হয়ে যাচ্ছে।
অর্থাৎ, এখন থেকেই সব ওজনগুলো মার খাচ্ছে।
কয়েক ঘণ্টা আগেও
ঘরের মধ্যে সবাই
হাত-পা-বুক-মাথা দিয়ে
একটা বিরাট পাথর ঠেলছিলো—
আর ঠিক যখন বুড়ি চোখ-বুজলেন
ওজনটা ফস্‌কে গড়িয়ে গেলো।

স্নানের পর
একটা ছোট ঘটিতে জল ভরে
সকলের পিছুপিছু
নাতি বাড়ি ফিরলো।

কন্টিকারী ভ্রূমধ্যে ইতস্তত

মৃণাল দেব

রমণীর
স্তনের নীচে
ঠোঁটের নীচে
যে সব কন্টিকারী
কানামাছি কোরে
সে সব আমার ভ্রূমধ্যে ইতস্তত

নীরা ওরফে তালগুড়
রুমালের ফুল তোলা
মাড়িতম দাঁতে ট্র্যাফিকের লাল
ললিপপ ললিপপ
হলদিয়ার ভিতে ন্যালাখ্যাবা
পুরীষের মেঘে বৃষ্টি

রক্তের সেতুগুলি সব
ফুলটুসির ঘরে চিত্ররতি
ফুলদানী ঘিরে নীল মুখ
জোঁকের উদরে হাত রেখে
ঐশ্বর্যের মুখে হুন

কদমগাছের নীচে
রসকলি চোখ টিপে
ওরফে মহাজন
বাঁশির মুদারা ঘিরে
শুঁয়ো পোকা আড়থেমটা
কুষ্ঠের ঘনে রাসলীলা

ভ্রূমধ্যে কন্টিকারী
কানামাছি কোরে উতস্তত
ছায়ায় প্রপাতে উঁকিঝুঁকি

কোনো বসন্তের জন্য

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

চৈত্রের প্রখর রাত্রে বসেছিলে বসন্ত উদ্যানে
সমস্ত প্রান্তর ঘিরে
সত্তার গভীরে

তোমার একক ইচ্ছা উত্তাল তরঙ্গে সমর্পিত
জৈবিক বাসনা মাতে উন্মোচন গানে।

সময়ের গাড়ী যায়। চলে গেলে
দূরতম নিরপেক্ষ-স্রোতে
আকাশের নোনা নীল শরীরী প্রেমের ক্ষতে
উজ্জ্বল আবীর।

হাওয়া বইছে চৈত্র রাতে—বিপুল হাওয়ায়
পলাশের ডাল ভাঙে
কণাগুলি আজন্ম রক্তের
শিরায় ফোটেনি ফুল চৈত্র-শেষ রাতে।

কোটি কোটি গর্ভস্থ মৃতদেহ আত্মস্থ হয়ঃ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে গেছে অনেকদূর, হাওয়ার সীমানা ছাড়িয়ে,
আমি চলে গেছি কোটি কোটি নজর এড়িয়ে,
নাটকের শেষ পরিণতির পর কি থাকে, কি হয়, কি হতে পারে
উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত দর্শক, রুগ্ন অবসন্ন শরীর
রুদ্ধশ্বাস সময়ের অসমতল পরিশ্রমে
মধ্যশেষ রাতের ঘুম ছোঁয়ায় হাই ওঠে।
দরজা পার হয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি পার হয়ে এলোমেলো বিছানা ঘর
সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে গেছে সীমানা ছাড়িয়ে
খুঁজেছি আমার বিছানাঘর সিঁড়ির পাশে অবসাদ তন্দ্রায়
নাটক দর্শকের ভগ্নাংশ আমি
সেই সিঁড়ি দিয়ে চলে গেছি এ ঘরের নজর এড়িয়ে।

কারুকাজ-করা প্রাসাদে আমি একা
আমার কথার শব্দে চমকে উঠি,
চার পাশে নির্জন স্বাক্ষর, পায়ে পায়ে হিজিবিজি আঁকা,
আমার ঐশ্বর্যে আশ্চর্য আমি চীৎকার করে উঠি,
প্রহরী নেই, সৈনিক নেই, সচিব নেই, সংগকন্যা নেই আমি একা,
আমার অর্থহীন নীল নৃত্যে আমি নর্তক নগ্ন নির্জন,
আমার ছায়ার দর্পণে আমি ছবি হয়ে উঠি,
আমি এক নেপথ্য নায়ক
কোটি কোটি সবুজ লাল সাদা হৃদয়কে
নিষ্ঠুর ভয়ংকর দানবের মত আমি হত্যা করেছি
সেইসব হৃদয়ের রক্তে গড়া কার চিত্রিত প্রাসাদে
আমি একা নিঃসঙ্গ সম্রাট।
নিঃসংকোচে দুহাত চড়িয়ে গান গাইতে চাইলাম
কোন একজনের কাছে পৌছিয়ে দিতে,
শেষ পরিণতির পূর্বে শতাব্দী শতাব্দী সংকর পাপ থেকে মুক্তি পেতে,
ঘুম ছোঁয়া ছোঁয়া চোখ, তবু ঘুম নেই,
কোটি কোটি মৃত মুখ জীবন্ত হয়ে উঠছে,
সংহত সক্রিয় ওরা বিলম্বিত, দ্রুত নিয়ে কেড়ে নিতে আসছে
আমার প্রাসাদ।
নির্বাসন দেবে আমায় অন্ধকার কবর অথবা শ্মশানের ছাইয়ে।
আর্তনাদ করে উঠিঃ আমি স্রষ্টা নিঃসঙ্গ সম্রাট
ঐশ্বর্যে, আশ্চর্যে, শিল্পে, কারুকাজে আমি একা একা।
ঘৃণা ভয় পাপ দিয়ে আমি আজ নৃশংস ভীষণ।
আমাকেই হত্যা করেঃ কোটি কোটি মৃতদেহ আত্মস্থ সমাধি।

সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে চলে গেছে আমার বিছানাঘরে
বিস্রস্ত বিছানাঘরে নির্বাসিত আমি একা ঘুমিয়ে পড়েছি।

আকস্মিক
অজিত রায়

দর্পণে অনেক দৃশ্য। দৃশ্যমান বিদায়ী সূর্যের
অলস-রঙিন ছবি, হাতে নিলে—
দুই হাত নীলপদ্ম হয়।
কেননা, অনেক রাতে আমি সব দৃশ্যগুলি স্বপ্ন বলে ভাবি।

প্রতিদিন প্রতিরাত ছবি আর স্বপ্ন উপহার
তুলে নিই দুই হাতে। রক্তময় তীক্ষ্ণ অহঙ্কার—
অন্ধকারে গান গায়। আমি তাই শুনেছি শরীরে।

রক্ত ঝরে
রণজিৎ দেব

অন্ধকারেই জেগে আছি। কোন্ সে সিঁড়ির অতলতায়
পদধ্বনির আওয়াজ ওঠে। আওয়াজ শুনি,
ঘূর্ণি ঝড়ের গোপন হাওয়ায়
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে, রক্ত ঝরে—
রক্ত ঝরে গোপনতায়।
কখন যেন ডিঙিয়ে যাই—
সিঁড়িগুলি, পায়ের নীচে
একাগ্রতায়
কী ভয়ঙ্কর বাঘের থাবা! অন্ধকারে
রক্ত নদী ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে—
ঘূর্ণি ঝড়ে!
রক্ত ঝরে—রক্ত ঝরে—রক্ত ঝরে।

প্রতিশ্রুত তুমি
মদনমোহন বিশ্বাস

এ-ক্ষেত-খামার—
ফটোগ্রাফার
জ্যোৎস্না বলে ভেবেছিলো।
নিঃশেষে তাই চাইনি পেতে—
মন বলেছে : কক্ষনো না—কক্ষনো না।
তথাপি এক নদীর স্বরে
সমুদ্র যে বলেছিলো :
গান শোনাবো, তোমায় আমি গান শোনাবো।

আমার বুঝি কথা ছিলো। বলবো আমি হয়তো বা তাই—
রক্তে যখন আরেক দিনের
গোপন বাতাস। বাজবে শুধু—নিঝুম সানাই।
হয়তো তুমি আমার কথা শুনবে না আর তেমন দিনে।
কেমন করে তাই বা জানাই?

দীঘির চারপাশে
শিবেন চট্টোপাধ্যায়

দীঘির সোপান বেয়ে শ্যাওলা জমা পৈঠার দু'পাশে
কি খুঁজিস অশ্রুমুখী মেয়ে,
আগাছা বা ঘাস হাত—কাঁটা গাছ তীক্ষ্ণ নীল চোখে?
বিদ্রূপ ছড়ায় রোদে
রিক্ততার হাহাকারে ঘোলাজল ঝাপসা চোখ বোঁজে।

কি খুঁজিস অশ্রুমুখী
পদ্ম ফুল ফোটেনি—ফোটে না
পায়ের আলতা রঙ ধুয়ে দিয়েছে ঘোলাজল দীঘি

শ্রাবণের ধারাজলে ভেসে গ্যাছে তোর খেলাঘর
কি চাস রে অশ্রুমুখী—অন্ধকার অতল অবধি।

প্রত্যুষার ক্ষীণ হাসি মুছে যায় ত্যাখ খররোদে
আলতা রাঙা পদচিহ্ন কোথা তুই খুঁজে পাবি বল?
সেঁজুতি সন্ধ্যার রঙ—ধূলিঘর—ডুবে গ্যাছে ওই ঘোলাজলে
কি খুঁজিস অশ্রুমুখী—আঁধার যে দিগন্ত অবধি।

উঠে আয় দীঘি পাড়ে—ওরে তুই ঘরে চলে আয়
ভাঙা পৈঠা ডুবে যাচ্ছে আগাছার কঠিন আক্রোশে
খেলাঘর—জলছবি—আলতা ছাপ পায়ের আলপনা
কোথা পাবি অশ্রুমুখী
বিস্তারিত কাঁটাগাছ বাহু মেলছে আকাশ অবধি।

দিন রাত ছায়া

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

শুশ্রূষা হাত আর স্বপ্ন
দেখতে দেখতে
পথ আর পেরিয়ে যাওয়া হল না
কারো কপাল আগুনের টুকরো জ্বরের মত
নিভাঁজ চাদর
পথ আর পেরিয়ে যাওয়া হল না

হাত শুশ্রূষা নিঃশ্বাসের মত দীর্ঘ সময়
নদী সেই পাহাড়
কোথায় কতদূরে কোনখানে
স্বরে ছায়ায় দিনরাত
আমি দিনরাত স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেন হারিয়ে ফেলি
কেন হারিয়ে যাই
কোথায় কতদূরে কোনখানে।

হৃদয় সংক্রান্ত : দুটি কবিতা

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

স্মৃতির পাখিটা ডানা নাড়ে।
আম নিম বাতাবির ডালে
রাত ঝরা শিশিরের রঙ
ভাবনা ইজেলে আঁকে
চেনা সেই মুখের আদল :
শ্রাবন্তীর কারুকার্য তুচ্ছ যার কাছে
মন যার কোণারক হাজার বছর॥

২

ঘোড়াটা ছুটছে বেয়ারা : রাশ টান
সবুজ তৃণের সীমা অদূরে ছড়ানো
রাশ টান : বে-সামাল ঘোড়াটা বর্বর॥

নীলকণ্ঠ

সুখলাল রায়

কী চাই আমি, ঠিকানা তার কোথায়?
শূন্য হাতে কেবল কানাকড়ি। জটিল জীবন, কেবল গ্লানি মেখে
সারাটা দিন কাকে খুঁজে মরি?
শক্তিশেলে জর্জরিত ক্লান্ত দেহপ্রাণ!

রাত্রি আসে দুচোখ ভরে—অন্ধকার ও ঘুম।
ঘুমের নেশা কেউ যদি আর ভাঙাতে না আসে—
তা হলে এই রাত্রি শুধু—রাত্রি থাকে
আমার চিরকাল!

তথাপি এই দিবারাত্রির চাকা বিরামহীন।
সূর্য ওঠে। শত্রু আমার—
অহঙ্কার ও ভয়।
কেননা, এই রক্ত রঙে বিদ্ধ করে বিষাক্ত এক তীর।
আমায় সে যে ব্যক্ত করে, নিঃস্ব করে, স্বপ্ন ভেঙে দেয়—
যখন আমি পান করে যাই অন্ধকারের গ্লানি।
আমার গোপন দারিদ্র ও ক্ষয়
থাকে না আর আমার মতো হয়ে।

হে অনন্ত, রাত্রি আমার, আমার গোপনতা—
আর কিছুকাল অন্ধকারে থাকো।
কেন তুমি তোমার সাথে আমায় ভেঙে দাও—
আর কিছুকাল অন্ধকারে রাখো।

তথাপি এই সূর্য ওঠে। আলোর আঙুলগুলো
অন্ধকারের কপাট ভেঙে দেয়।
আমি যে তার কণ্ঠস্বরে নিজের কথাই শুনি:
"নিঃস্ব তুমি, দৈন্য ভরা, বিষাক্ত ক্যান্সার!"

দিবারাত্তির নীল মোহনায়, থাকবো আমি
আকণ্ঠ নীল হয়ে।

দ্বাদশ পদী
দেবকুমার বসু

অমন করে তাকিয়ে থাকো কেন
বলো না, যদি বলার কিছু থাকে
তোমার আগে, বলতে পারি যেন
এতেই যদি লজ্জা তোমার ঢাকে।

চলার পথে তোমায় দেখি যত
পাই না ভেবে বলব আমি কি যে
হৃদয় আমার কেঁপে ওঠেই তত
তোমায় কিছু বলতে হবে নিজে।

তবুও আমি তোমায় দেখি রোজ
তবুও কথা হয় না বলা হায়
তবুও আমি পাই না কোন খোঁজ
সে কোন কথা তোমায় বলা যায়।

মাতাল নদীর শব্দ : ১
শ্যামল বসু

প্রতিদিন ভোর বেলা থেকে
আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার ভয় করে
নিজেকে বিশ্বাসঘাতক অথবা নিজের মত
অন্যদের বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয়।
গালের ব্রনতে আঙুল দিলে,
সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়।
ক্লান্ত শকুনের মত আমার চুল খাড়া হয়,
দাঁড়িয়ে থাকে লবণ স্বাদের নদীর থেকে
উৎড়ে আসবার জন্য।

সূর্য, এবার তোমার বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ
নন্দিনী আমাকে গতকাল স্বপ্নে এবং ব্যক্তিগত বাস্তবে
সে সব কথাই বলেছে।

কত শব্দ, কত ভালোবাসা এবং পাখীর গান
কেবল বিশ্বাসহীন মূল্যবোধে মুহ্যমান হয়ে
নির্বোধের মত হাসছে।

যখন ইচ্ছে করে, মাঝ রাতে, আমার প্রেমিকাকে
পত্রতাড়িত করি, তখন তুমি অন্ধকারের সঙ্গমে
নিজের শরীরে শ্বেতরক্ত ঢেলে দিয়ে অবসন্ন থাকো।
ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষ ভাবে,
নেপচুনে ইউরেনাসে অথবা প্লুটোয় নামবে
সমস্ত সংবাদপত্রে ছড়িয়ে দেবো
প্রবীণতম প্রতিবেশী হলেও
সূর্যই প্রবীণ বিশ্বাসঘাতক।

চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ প্রসঙ্গে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

সত্য গুহ কখনো হাঁটেন না। ছোটেন। ছোটেন হন্-হন্ করে। মাটি কাঁপিয়ে। কথা বলেন না—গলা সপ্তমে তুলে বক্তৃতা করেন। তাঁর হাসিটিও আর পাঁচজনের মতন কেবল মুখের ভেতরটুকুতে ব্যাপ্ত থাকে না। কিংবা ঠুন্ করে একবারটি শব্দ করেই চুপ হয়ে যায় না। হাসেন হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ। গোটা শরীরটাই যেন ফাটতে থাকে। আশপাশ গমগম্ করে। সত্য গুহর মুখটা অনেকটা গথিক। এক মাথা ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। গোটা কপালে চড়াই-উৎরাই। প্রচণ্ড জেদী। প্রচণ্ডতর গোঁ। দিনের মধ্যে কবিতা লেখেন ঝাড়া আটঘণ্টা। আরো আটঘণ্টা কবিতার ভাবনা। খেতে বসে লেখেন—কথা বলতে বলতে লেখেন। আড্ডায়, সভায়, কাজের ফাঁকে সব সময় লেখেন। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে কিংবা পিকনিকে খাতা এবং কলম তাঁর চাই-ই। জনশ্রুতি, সদ্য সিঁদুর-চাপানো এক মহিলার সামনে বাসর রাত্রিতেও তাঁর এই অভ্যাসে ছেদ পড়েনি।

এবং এখানেই সত্য-র সততা। সত্যর কবিতা হল সত্যর পৃথিবী। কেন না, সত্যর কবিতা ঠিক বর্ণিত-সত্যেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

"চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ" তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। রচনাকাল ১৩৭১ থেকে ১৩৭৩। কিন্তু গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির গায়ে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে এ সমস্ত লেখার আগেই আসল লেখালেখির পালা কবি চুকিয়ে ফেলেছেন। এবং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গেলে সেই ধারণাটাই ক্রমে বদ্ধমূল হবে। বুঝতে পারা যায় কবি কতোখানি নিষ্ঠা এবং শ্রম সহকারে স্বীয় মুখ আবিষ্কার করেছেন চেনা-অচেনা ভীড়ে।

এই মুখ আবিষ্কারের নিরবধি প্রচেষ্টায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন পর্ণা—তাঁর কবিতাকে। তাঁর পর্ণা এই চলমান পৃথিবীর প্রতিকৃতি—যে পৃথিবী তথা জীবনে লোভ, ক্ষোভ, বেদনা, বঞ্চনা, নৈরাশ্য, উদ্দীপনা যৌনতা, সংগ্রাম এবং মহৎ পিপাসা। কবি এই বিপুল সমারোহে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন আপন বিশালতায়। আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে আনেন সেই সব রক্তাক্ত, অভিজ্ঞতা—যা তিল তিল করে তাঁর পর্ণার পূর্ণাবয়ব।

"জনস্রোত বরাবর অনন্ত রাত্রি" দেখে তিনি আর্ত চিৎকারে বলে ওঠেন "এখানে বসতবাটি নেই—বসতবাটিতে ঘর নেই"! শুধু কি তাই! কোথাও

তাঁর যাবার জায়গা অব্দি নেই। কিন্তু তা বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হবে? জীবন, সমর আর সবিতার সঙ্গে অসম্ভব আড্ডা দেবার জন্য অবনীর বাড়ী কি নেই? কবি জীবনের অতলে নেমে বুঝতে পারছেন সমগ্র জীবন ভর তিনি নির্বাসিত। তাই "অসহায় হওয়া ছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই।" এবং যৌন সর্বস্বতাই এ যুগের পরম সান্ত্বনা—তথা নিরাময়—তথা শতাব্দীর মৌন অসুখ। কিন্তু তা বলে অসুখের কাছে বসে সোহাগে আহ্লাদে ডগমগ থাকতে হবে অথবা চুপচাপ জীবন সর্বস্ব সঁপে দিয়ে শ্মশানের দিকে তাকাতে হবে। না, কিছুতেই না। সত্য গুহ হাঁটেন না ছোটেন। তক্ষুনি কবির মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া। ছটফট করেন। এবং অতঃপর তিনি এক আলোকময় সিদ্ধান্তের কূলে এসে আছড়ে পড়েন—"বস্তুত বিংশ শতাব্দীর মূলে এক ঢল জলের দরকার।"

হায়! জিব কিন্তু সেই এক ঢল জলের কথাই বলেন মাত্র। সেই জল খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন না। কেননা—আবার তাকে পিছু টান হয়ে অসুখের কাছে ছুটতে হয়। সত্য গুহ 'জলের জন্য' সমুদ্রে যাবেন কবে?

এবং উপরোক্ত কারণেই তাঁর কবিতায় কখনো পুনরুক্তি, কখনো বাগ-বিস্তৃতি, কখনো শব্দের পর শব্দের ঝংকার আবার কখনো বা চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পের বিপুল সমাবেশ। তবুও স্মর্তব্য যে, সর্বত্রই কবির নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। সর্বত্রই সেই আবেগ বিহ্বল উচ্চ কণ্ঠ উপদ্রুত অথচ জীবন নিষ্ঠ সত্য গুহ।

সত্য গুহ সমুদ্রে কবে যাচ্ছেন?

চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ : সত্য গুহ। গ্রন্থজগৎ : ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস কলকাতা ২৯। দাম দুটাকা।

তুলসী মুখুজ্জের কবিতা

শম্ভুলাল চট্টোপাধ্যায়

রূপকথার পাগলা নায়ক বলে, কী করি কোথায় যাই "হাঁসকল ডুকুনি জলুই পেরেক"।

কী করি কোথায় যাই পর্যন্ত না বোঝার কিছু নেই। কিন্তু হাঁসকল ডুকুনি জলুই পেরেক? বোঝেন কিছু? হাঁসকল ডুকুনি জলুই পেরেক? আমি তো মনে করি তুলসী মুখুজ্জেকে একথা বললে তিনি আমার সঙ্গে একমত হবেন।

তিনিও বিশ্বাস করি বলবেন এ-দুনিয়ায় কোন শেষ সিদ্ধান্ত নেই—সব হাঁসকল ডুকুনি জলুই পেরেক। কিন্তু তারপরেও তিনি বলবেন, শেষ সিদ্ধান্ত নেই ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এই যে ক্ষমতার হাতের মারধোর সারা দুনিয়ায় বুদ্ধির একচেটে ফাঁদ।

আমি তুলসী মুখুজ্জেকে জিজ্ঞেস করলাম লেখেন কেন? বললেন, কখনো চুলকে ওঠে, কখনো কামড়ায়। আর ভেতরে ভেতরে আছে যশ, অর্থ প্রতিষ্ঠার টাটানি। সেটা না বললেও কোন বেটা বোঝে না? শুয়েছিলেন। উঠে বসে বললেন, সার্চ লাইট ফেলবেন না। সবটা দেখতে এগোবেন না।

তাঁর কবিতাতেও এমন একটা ভাব : 'সাবধান আর একপাও নয়—তাহলে কন্তু মুখের উপর দড়াম করে দরজা পড়ে যাবে"।

ভেতরে একটা সুকঠিন ব্যক্তিত্বের মালিক তুলসী মুখুজ্জে ওপরে যে ব্যবহার করেন তা মোটামুটি আর পাঁচটা লোকের মতই আপোষী। বলেন, আপোষটা দরকার—আপোষের সঙ্গে আপোষ।

ধরুন আজকের দিনে। আমরা ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, রমনপর ইত্যাদি অনেক কিছু একটু বেশী পরিমাণে হয়েছি। আর সেকথা সকলেই বলি। তুলসীবাবু বললেন, ঠিকই কথা হলো কিন্তু আমরা রোজ রোজ এ রকম নই। আমি মনে করি না আমি রোজ ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ বা রমনপর হয়েছি।

আমার মনে হয় তুলসীবাবু অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন সেগুলিকে চোলাই করে। তাঁদের অভিনয় ধরে ফেলেন। শিগগিরই আসল রূপ বের করেন। এই দিক থেকে তাঁর কবিতার গায়ে লেখা তুলসী মুখুজ্জে তুলসী মুখুজ্জে তুলসী মুখুজ্জে নামাবলির হরেকৃষ্ণ হরেরামের মত। দেখলেই চেনা যায়।

তুলসীবাবুর কবিতায় ক্ষণে ক্ষণেই উদঘাটিত হই আর দেখি-ও। কখনো যেন পা টিপে টিপে কবিকে অনুসরণ করেছি, ঘাড়ের কাছে হাত রেখে মাথাটা টেনে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন অদূরের রক্তলেহী বাঘিনী। আবার কখনো গল্প করতে করতে চলেছি। কান মাথা চোখ সব ফাটিয়ে হঠাৎ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে ভীষণ এক তুফান মেল। এক কথায় তুলসীবাবুকে যা বুঝেছি…

না মশাই বুঝিনি। কোন খোপেই তাঁকে ফেলতে পারছি না। অথচ তিনি হয়ে উঠেছেন এমন নয়। হয়ে আছেন। আর হচ্ছেন যদি বলতে হয় সে পরিণত।

তাঁর চোখে স্বপ্ন দেখছি না। দেখছি গভীর বেদনা। আমরা কেন এমন দুঃখজনক তার কারণ যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা নয়। আমার মনে হয় তিনি সঙ্কটে পড়ে আছেন। তাঁর রক্তাক্ত চেতনা মুক্তির সন্ধান করছে। তাই তাঁর লেখায় গানের অভাব—এক তির্যক শুষ্ক বিষণ্ণ ভাব।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

প্রথম সঙ্কলনের সূচী

অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমর সেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমোদ মুখোপাধ্যায় মণিভূষণ ভট্টাচার্য হরপ্রসাদ মিত্র সুশীল রায় বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায় অরুণ ভট্টাচার্য নন্দগোপাল সেনগুপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব বসু সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রাম বসু অরবিন্দ গুহ সিদ্ধেশ্বর সেন কৃষ্ণ ধর তরুণ সান্যাল আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত গৌরাঙ্গ ভৌমিক রামেন্দ্র দেশমুখ্য শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত বঙ্কিম মাহাতো পবিত্র মুখোপাধ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশরঞ্জন দত্ত শান্তি লাহিড়ী সামসুল হক দক্ষিণারঞ্জন বসু অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ধনঞ্জয় দাশ পুষ্কর দাশগুপ্ত ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সুদর্শন রায়চৌধুরী মৃণাল দত্ত রত্নেশ্বর হাজরা বাসুদেব দেব চিন্ময় গুহঠাকুরতা আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত আশিস সান্যাল গণেশ বসু পরেশ মণ্ডল মৃণাল বসুচৌধুরী দুর্গাদাস সরকার সত্য গুহ তুলসী মুখোপাধ্যায় মুকুল গুহ সামসের আনোয়ার জয়ন্তকুমার শিবশম্ভু পাল রবীন্দ্র গুহ সেবাব্রত চৌধুরী কালীকৃষ্ণ গুহ মঞ্জুলিকা দাশ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী *

গৌরাঙ্গ ভৌমিক [প্রধান সম্পাদক] দেবকুমার বসু

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সঙ্কলন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বেরোবে। তৃতীয় সঙ্কলন মে মাসে

দাম ঃ প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান *

অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা ১২

সিগনেট বুক শপ কলকাতা ১২ ও অন্যত্র

* *

ANUBHAV [Poetry Qtly.] Vol. I No. 4 March 1967 : Re 1·00
অনুভব [ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র] বর্ষ ১ সংখ্যা ৪ ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

কবিতা নিয়ে অনেকেই ভাবছেন, তার প্রচারে প্রসারে অনেকের চেষ্টার অন্ত নেই। অনুরাগী কবিতা পাঠকের কাছে অনুভব গোষ্ঠিও নিত্য নতুন উপহার দেবার কথা ভাবছেন। তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা"র ধারাবাহিক সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ। দ্বিতীয় উদ্যোগ "কবিতা প্রচার পুস্তিকামালায়" নিয়মিত কবিতা প্রচার। এই গ্রন্থমালায় শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—

১। হে অগ্নি প্রবাহ। রাম বসু

২। এখন সময় নয়। শঙ্খ ঘোষ

৩। আমার হাতে রক্ত। কৃষ্ণ ধর

৪। অস্থিমজ্জা মাংস ইত্যাদি। শান্তি লাহিড়ী

৫। এ যেন বারবেলা। সত্য গুহ

৬। নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ। পরেশ মণ্ডল

এক একজন কবির ষোল পৃষ্ঠার কবিতা ও কবি পরিচয় প্রতিটি পুস্তিকায় থাকবে। প্রতিটি পুস্তিকার দাম ৫০ পয়সা। বৎসরে ১২টি পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুভব গোষ্ঠি কবি ও পাঠকদের সহযোগীতা কামনা করেন।

প্রাপ্তিস্থান : **সিগনেট বুক শপ** কলকাতা বারো

Editor : GOURANGA BHOWMIK

Published by Sajal Banerjee from 19, Panditia Terrace, Calcutta-29 &
Printed by Nirmal Kr. Paul at Nirmal Mudran 8 Brojodulal St. Cal-6.

এই সংখ্যার দাম এক টাকা